

শকুন্তলা শ্যানাটোরিଆମ

শ୍ରীঅজিতকৃষ্ণ বসু
(অ-ক-ব)

কল্লোল প্রকাশনী
কলিকাতা - ১২

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ :

୧୧୫ ଭାଦ୍ର,

୧୯୭୧

ପ୍ରକାଶିକା :

ଶ୍ରୀମତୀ ଶୋଭା ରାୟ

କଲ୍ଲୋଲ ପ୍ରକାଶନୀ

ଏ-୧୦୫, କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ ମାର୍କେଟ

କଲିକାତା-୧୨

ମୁଦ୍ରକ :

ଶ୍ରୀଗଞ୍ଜେଞ୍ଜନାଥ ଚୌଧୁରୀ

ପ୍ରିଣ୍ଟାସ' କର୍ନାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲି:

୧, ଗଞ୍ଜାଧର ବାବୁ ଲେନ

କଲିକାତା-୧୨

ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନପଟ ଶିଳ୍ପୀ :

ଶ୍ରୀବେଂଶୁଧର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

ମୂଲ୍ୟ : ଛୁଇଁ ଟାକା ପଞ୍ଚାଶର ନୟା ପୟସ।

ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী লিখেছিলেন “চলে এসো। বিনা দ্বিধায়।” চলে এসেছি। দ্বিধা করিনি। ট্রেনে ভিড় ছিল, ভ্রক্ষেপ করিনি। ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠীকে আমি শ্রদ্ধা করি।

মগজের বিকার ও বিকৃতি সম্বন্ধে ডাক্তার ত্রিপাঠী একজন নামজাদা বিশেষজ্ঞ। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন মগজের বিকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করে আনবার জন্তে। মোটা মোটা বিদেশী ডিগ্রী আর অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার ফিরে এসেছেন দেশের গণ্ডির ভেতরে, দেশের লোকের শ্রদ্ধা পাচ্ছেন বিস্তর। সেটা যে শুধু বিদেশী ডিগ্রিগুলোরই জন্তে, সে কথা বললে তাঁর এবং তাদের অযথা অপমান করা হবে।

ভারতের একটি শৈল-বিজ্রাম অথবা হিল স্টেশন। সেটির নাম অনায়াসেই বলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু না বললেও কোনো ক্ষতি হবে না। সেই শৈল-বিজ্রামের বৃকে বিজ্রাম করছে একটি লম্বা-চওড়া স্তানাটোরিআম, যার অতিথিদের কারো মন সাধারণ বাঁধা সড়ক বেয়ে চলে না; সাধারণ পথের সীমানা ছাড়িয়ে যখন তখন পা বাড়ায় অসাধারণ বিপথে। এই অসাধারণই তাঁদের এখানকার আতিথ্যের কারণ।

গোটা স্তানাটোরিআমের ব্যয়-বাহক পৃষ্ঠপোষক কোটিপতি শেঠ কিষণলাল ভরদ্বাজ, তাই সরকারী বদান্ততার প্রয়োজন বোধ বা কামনা করেনি স্তানাটোরিআম। প্রথম যৌবনে শেঠজী লক্ষপতি

হয়েছিলেন, এখন কোটির নিচে কান পাততে রাজী নন।
তিনিও স্থানাটোরিআমের একজন পাকাপোক্ত অতিথি।

স্থানাটোরিআমে নিজের বাংলোর পাশের বাংলাতে আমার
থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। সঙ্গে মালপত্র
বিশেষ কিছু আনিনি, শুধু একটা স্যুটকেসে কিছু কাপড়-চোপড় আর
ডায়েরি লিখবার মোটা বাঁধানো খাতা।

ডাক্তার ত্রিপাঠী এই স্থানাটোরিআমের সর্বাধিনায়ক, যাকে
ইংরেজদের ভাষায় বলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট্‌। তাঁর সহযোগিতার আছেন
একাধিক ডাক্তার এবং ততোধিক নার্স প্রভৃতি। কিন্তু অত খুঁটিনাটির
ভেতর যাবার দরকার নেই। এখানকার পুরো ক্যাটাগরি লিখতে
বসিনি।

এখন একটু কিষণলাল ভরদ্বাজের কথা বলি। বিরাট বাগানের
ঈশান কোণে কিষণলালের বাংলা। তার সেরা দক্ষিণবাতায়নী
কামরায় আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়ে আরাম করছেন
কিষণলাল। আমি আমার খোলা জানালা থেকে দেখছি তাঁকে।
কখনো আপন মনে হাসছেন, কখনো বা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন।

“শেঠ কিষণলালের পুত্র ছিল একাধিক, কল্পা মাত্র একটি।”
বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। “কুমারী শকুন্তলা ভরদ্বাজ। শকুন্তলা
প্রথমে ছোট ছিল, কিন্তু নিত্য উঁখাও কালের যাত্রার রথ তাকে ছোট
থাকতে দিলে না। শকুন্তলার দেহে মনে এলো যৌবনের জোয়ার।
এদিকে বাপের অগাধ টাকা। অনেক ধনকুবেরের ছুলাল শকুন্তলার
প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল, কিন্তু বড়লোকের ছেলেতে রুচি নেই
শকুন্তলার। সে চাইলে গরীব প্রেমিকের প্রেম। কোথায় সেই
গরীবের ছেলে, যে প্রেমে পড়বে শকুন্তলার, যার প্রেমে পড়বে
শকুন্তলা? কোথায়? কোথায়? শকুন্তলার চিন্ত উদাস হয়ে উঠলো
সেই না-জানা প্রেমিকের জন্তে। এমন সময় শকুন্তলার জীবনে এলো

হুয়ন্ত তেন্দুলকার ।”

“গরীব ?”

“সুখ গরীব নয়, তার ওপর দেবার দেনা গ্রন্থ ।”

“গরীবকে ধার দিলে কে ?”

“হুয়ন্তের বাক্জালে যারা মুগ্ধ হলেন তাঁরাই । শেষ পর্যন্ত শকুন্তলাও । টাকা যত চাইতে লাগল তত দিতে লাগল শকুন্তলা, খুশী হয়ে নিতে লাগল হুয়ন্ত । কিন্তু হুয়ন্ত যা চেয়েছিল তার চাইতে বেশী দিয়ে ফেলেছিলো শকুন্তলা—টাকার সঙ্গে হৃদয় । সেইটি টের পেয়েই বিগড়ে গেল, বঁকে বসল হুয়ন্ত তেন্দুলকার । বললে—টাকা ধার চেয়েছিলাম, যখন পারি শোধ করবো বলে—কারণ না পারলেও তোমার কিছু আসবে যাবে না । হৃদয় নেবার বা দেবার তো কোনো কথা ছিল না ।”

কচের পেছনে দেবযানীর মত হুয়ন্তকে অতিষ্ঠ করে তুলল শকুন্তলা । অতি-রোমাঞ্চিক শকুন্তলা । পাগল হয়ে উঠল তার চিত্ত হুয়ন্তের জন্তে । কি যে দেখেছিল হুয়ন্তের ভেতর, তা সেই জানে ।

হুয়ন্ত শেষকালে একসঙ্গে শকুন্তলার কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল । ইংরাজিতে টাইপ করে শকুন্তলাকে একখানা চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দিলে, তাতে লেখা “তুলে যাও আমাকে ।” তলায় কোনো দস্তখৎ নেই । হাতের লেখা কোনো দলিল শকুন্তলার হাতে তুলে দিতে রাজী নয় হুয়ন্ত ।

হুয়ন্ত-অভাবে ভ্রিয়মানা শকুন্তলা—শেষটায় একদিন ভরদ্বাজ ভবনের তেতলা থেকে শানবাঁধানো ফুটপাথে পড়ে মারা গেল । সন্দেহ করা গেল শকুন্তলার এই অধঃপতন ও মৃত্যু হৃদ্যটনা বটে, কিন্তু ‘অ্যাক্সিডেন্ট’ নয় । শকুন্তলা ইচ্ছা করেই লাফিয়ে পড়েছিল, যদিও এই ইচ্ছাটা তার মনের সূস্থ অবস্থায় হয়নি বলেই অনেকের ধারণা । কেউ কেউ শ্রেষ্ঠত্বকে বলেছেনও সময়মতো কোনো ভালো মনের-

ডাক্তার দেখিয়ে শকুন্তলার মনটা ঠিক করিয়ে নিলেই এ ছুঁইটনাটা ঘটত না, শকুন্তলা আজও বেঁচে থাকত। আর কেউ কেউ মনে মনে বলেছেন “শকুন্তলার মাথা আগেই খারাপ হয়েছিল, নইলে কি আর ঐ দুঃস্থ টোড়াকে অমন—?”

পুত্রেরা আগেই মরে গিয়েছিল, বাকী ছিল একমাত্র সন্তান শকুন্তলা। সেও মরে যেতে মন খারাপ হয়ে গেল শেঠ কিষণলালের, আর তাই থেকে দেখা দিল একটু একটু মাথা খারাপের লক্ষণ। এলেন নামকরা বিদেশ ফেরত মনের ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী; মনের ডাক্তারীতে ষাঁর তুলনা নেই সারা ভারতে।

“তারপর শেঠ কিষণলালের টাকায় আর আমার পরিচালনায় গড়ে উঠল পাহাড়ের বুকে এই শকুন্তলা স্থানটোরিআম।” বললেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী। “মনের হুঃখে সংসার ছেড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জগত থেকে বাণপ্রস্থ নিয়ে তিনিও এসে কায়েমী আশ্রয় নিলেন এই আশ্রমে। বিরাট ভরদ্বাজী ব্যবসা বাণিজ্যের কর্ণধারগিরি ছেড়ে দিলেন তাঁর উপযুক্ত ভাইপো এবং বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী চন্দনমল ভরদ্বাজের হাতে। চন্দনমল যেমন অসামান্য পাকা কর্ণধার, তেমনি অসাধারণ জ্যাঠাভক্ত। শেঠ কিষণলালের যে কোনো ছকুম অবিলম্বে অগ্নান বদনে বিনা দ্বিধায় পালন করে। এই স্থানটোরিআমের পেছনে জলের মতো হুহাতে টাকা খরচা করছেন শেঠজী, চন্দনমলের তরফ থেকে কোনোরকম বাধা আসছে না। অনেকে চন্দনমলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে শেঠজীর এই টাকাওড়ানো খামখেয়াল তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বন্ধ করা দরকার; কি হবে এক ঝাঁক পাগল পুষে বছর বছর টাকার আদ্ব করে? চন্দনমল হেসে বলেছে “টাকার আদ্ব নয়, পাগল পোষা নয়, এ হচ্ছে দামী গবেষণা। এই মহা গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন জ্যাঠামশায় শেঠ কিষণলাল। এর ফল মিলবেই একদিন।”

এই স্থানাটোরিআমের বাসিন্দারা সাধারণ সজ্জা পাগল কেউ নয়, অসাধারণ নয়না ছাড়া এখানে কাউকে অতিথি করে আনিতে আমি। তাই এ স্থানাটোরিআমকে হাল্কা ভাষায় বলতে পারো বিচিত্র চরিত্রের চিড়িয়াখানা।”

বললাম “কৌতূহল হচ্ছে খোদ কিষণলালজীর সঙ্গে আলাপ করবার।” “সোজা চলে যাও।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। গেলাম। “আমুন ধনপতি বাবু।” বললেন শেঠজী। আমি বললাম, “চেনেন না কি আমাকে?” শেঠজী বললেন “আসবেন গুনিয়েছিলাম ডাক্তার ত্রিপাঠীর মুখে।” তারপর এমন সহজভাবে কথা কইতে লাগলেন যেন কোনো দিনই তাঁর সঙ্গে অপরিচিত ছিলাম না। কিছুক্ষণ আলাপের পর শুধালেন “ডাক্তার ত্রিপাঠীকে কেমন মনে লাগছে?”

আমি বললাম “ভালোই তো।”

শেঠজী হেসে বললেন “পাগল।”

“পাগল?”

“খাঁটি পাগল। সেই জন্তেই তো ওঁরই উপরে এই স্থানাটোরিআমের জিম্মেদারি।”

বলে মহা আনন্দে হো হো করে হেসে উঠলেন শেঠ কিষণলাল ভরদ্বাজ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন “প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো আসছেন। গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের গ্রেট প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো।”

“আইয়ে ট্যাল্পেট্রোজি।” বলে প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোকে অভ্যর্থনা করলেন শেঠজী। “বুকমে ইতনা মেডেল বুলায়া?”

প্রফেসর বললেন “এ হামারা বুক নেহি শেঠজি, গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসকা সাইনবোর্ড হয়। হাম তো আপন বোল্কে কুছ নেহি রাখা, সব কুছ সার্কাসকো উৎসর্গ কর্ দিয়া।”

পাঁচ বছরে চেহারা বিশেষ বদলায়নি প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোর,

শুধু হয় তো স্বভাব-বিষয় চেহারা একটু বিষণ্ণতর হয়েছে, হাল্কা সৌন্দর্য হাল্কাও বেড়েছে একটু। সেই পুরাতন কোটে সেই পুরাতন মেডেলগুলোই ছিলছে। মনে পড়ে গেল সেই অতীত সজ্জার সার্কাসের আসরে কালো কোটের বুকে এক ঝাঁক সাদা মেডেল ছলিয়ে এসে সার্কাসের মালিক ম্যানেজার প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো জানানী দিচ্ছেন : এইবার শুরু হবে অতুলনীয় গাখার খেলা— “দি গ্রেট ডংকি অ্যাক্ট”, পরিচালনা করবেন “দি গ্রেট লায়ন-টেমার” মিস রেবেকা।

“ইন্কে সাথ পরিচয় কিজিয়ে ট্যাল্পেট্রোজি।” শেঠজী বললেন আমাকে দেখিয়ে। প্রফেসর আমাকে এতক্ষণ খেয়াল করেননি। কি একটা উদ্ভাল ভাবতরঙ্গ তাঁকে ভয়ংকর আনন্দনা করে রেখেছিল।

“হাঁ হাঁ, অবশ্য করোগা, শেঠজি।” লজ্জিত হয়ে বললেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। বলে আমার কাছে হয়তো ক্ষমা চাইতেন, কিন্তু সেই ক্ষমা চাওয়ার গোড়া মেরে দিয়ে শেঠজী আমার পরিচয় দিলেন :

“ধনপতি বাবু। ডক্টরজীকা দোস্তু। স্থানাটোরিআম দেখ্নেকো আয়ে হাঁয়্য।”

“অ।” বললেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। “দেখতে এসে আটকা পড়ে না যান। আমার মতো।”

“সেকি? আপনি আটকা পড়েছেন নাকি?”

“আর বলেন কেন?” বললেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। “আজ সে ছুতো, কাল সে ছুতো, ডাক্তারবাবু নাছোড়বান্দা। যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হল, বড় খুশী হলুম। আমায় হয়তো আগে দেখেননি, আমার নাম—”

আমি বললাম “আপনাকে একদিন দেখেছিলাম সার্কাসে, বছর পাঁচেক আগে, গ্যালারি থেকে।”

“এই দেখুন, এতক্ষণ বলতে হয়।” বলে উঠলেন ট্যাল্পেট্রো। “তাই

ভাবছিলুম এত চেনা চেনা লাগছে কেন ?”

গাথাটির কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। মনে হলো একটু যেন ব্যথা পেলেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো।

“সে এখন গদিতে বসেছে, চোঁহারা ভাঁড়িয়ে, ল্যাজ লুকিয়ে, হোমরা চোমরা, মহাদাপট, জয় জয়কার।” বললেন তারপর।

আমি বিশ্বয় বিস্তারিত লোচনে বললাম “কোথায়, কোন্ গদিতে ? কি হয়ে বসেছে ? অকিসার, না—?”

প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো বললেন “বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।” বুঝলাম এর চাইতে আর বেশি ধরাছোঁয়ার ভেতর যাবেন না তিনি।

বললাম “যাই বলুন, ওর ঐ সামনের ছ পা ওপরে তুলে দিয়ে পেছনের পা দিয়ে মাছুষী কায়দায় হাঁটা একটা দেখবার জিনিস হয়েছিল।”

বিষয় বদন ট্যাল্পেট্রো বললেন “ঐটে শিখিয়েই তো ম্যাসাকার করলুম।”

“গাথাটিকে হাঁটতে শিখিয়েছিলেন আপনি ? আমি ভেবেছিলাম বুঝি—”

“রেবেকা।” বললেন ট্যাল্পেট্রো। “সবাই তাই ভাবত, আর ভিড় করে আসত, চাবুক হাতে রেবেকা গ্রেট ডংকি অ্যাক্ট দেখাত বলে। আমি মশাই গুঁফো ট্যাল্পেট্রো, তালপাতার সেপাই, অমন ফিগারওয়ালী যুবতী নই, ও ডংকিকে আমি হাঁটালে অ্যাক্টো যদি বা হতো, গ্রেট হতো না। আর ঐ রেবেকা, রং যেন কাঁচা সোনা পাকা মর্তমান, যৌবন ক্ষেটে বেরোতে চাইছে আঁটসাঁট সার্ভিনের সার্কাসী পোশাক থেকে, ওর হুকুমের তাঁবেদার সার্কাসের গাথা হতে আশে সাধ আপনার জেগেছিল কিনা একবার বুকে হাত রেখে বলুন দেখি ?”

“হয় তো হয়েছিল, জানতে পারিনি।” পরশুরামী কায়দায় জবাব দিলাম।

সহসা সচকিত হয়ে উঠলেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো, কিছুক্ষণ

ধরে অবহেলিত, উপেক্ষিত হচ্ছেন শেঠজী। তাই বললেন তাঁর দিকে তাকিয়ে “হাম নেহি জান্তা আপ কেনা কহেগা শেঠজি, লেकिन হামারা সার্কাসকা গাথাঠো হামকো বুকমে বড়া দাগা দে গিয়া। হামারা তুখ হ্যায়, গিয়া তো গিয়া, আগারি খোড়া বোলকে কাঁহে নেহি গিয়া ?”

“বেইমান, বেইমান, বিল্কুল বেইমান।” চিন্তাকুল দরদী কণ্ঠে বললেন শেঠ কিষণলাল ভরদ্বাজ। প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোর গাথা পালিয়েছে, সেই ছুঁখে কেঁদে কেঁদে উঠছে শেঠজীর দরদী মন। মনে হলো গাথাহারা বেদনার স্বাদ তিনিও এক দিন পেয়েছিলেন। বোধ হয় তাঁর কোনো গাথাও এভাবে তাঁর প্রাণে দাগা দিয়ে পালিয়েছিল।

আমিও ট্যাল্পেট্রো-হৃদয়ে খানিকটা সাস্থনা-বারি সিঞ্জন করবার জন্তে বললাম “আপনি অকারণ ছুঁখ পাবেন না প্রফেসর। সরকারী বেসরকারী দপ্তরে অনেক গদী অনেক চেয়ার দেখেছি, অনেক সভায় সম্মেলনে সমিতিতে অনেক বক্তৃতা-বচন শুনেছি, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনার গাথা-ই একমাত্র গাথা নয় যে পালিয়ে ভোল ফিরিয়েছে। ‘চক্রবৎ পরিবর্তন্তে’ জানেন তো? এখন গাথাদের দিন পড়েছে, অস্বীকার করলে চলবে কেন?”

“জমানা বদল গিয়া ট্যাল্পেট্রোজি।” বললেন শেঠ কিষণলাল ভরদ্বাজ। “খনপতিবাবু বোল রহে হ্যায় কি গাথেকা হী আভি দিন হ্যায়। দিস ইজ্জ দি এজ্জ অভ ডংকিজ্জ।”

“হামারা গাথা ক্যায়সে পালায়া উ ভি এক বড়া করুণ কাহিনী হ্যায়। শুনেনেসে আপকো দোনো চোখমে জল আ যায়েগা শেঠজি।” বললেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। “আপ তো হামারা গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস-কা গ্রেট ডংকি অ্যাক্ট দেখা?”

“হাঁ হাঁ, জরুর জরুর, ট্যাল্পেট্রোজী। কম-সে-কম দো দফে তো জরুর দেখা। বহুৎ-হী সুন্দর খেল্। অ্যায়সা ঠর কতী নহী দেখা।”

“দেখেগা ভী নেহি, শেঠজি।” মলিন কণ্ঠে বললেন প্রফেসর

ট্যাল্পেট্রো। “ঐসা খেল কোই গাধাকো শিখানা কোইকো পিতাকো সাধ্যমে নেই কুলায়গা। আপ ভাবতা হ্যায় হাম আপনা ঢাক আপনা হাতমে পিটাতি? হাঁ, পিটাতি হ্যায়, অন্মান বদনমে হাম স্বীকার করেরগা। এ যুগমে আপনা ঢাক আপনি নেহি পিটানেসে কোই নেহি পিটায়গা, শেঠজী।”

“হাঁ হাঁ, বাত তো ঠিক হ্যায়।” শেঠজী বললেন।

আবেগে উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। বলতে লাগলেন “গ্রেট ডংকি অ্যাক্ট হাজারো লাখো আদমি দেখা—বাল্‌বাচ্চা মরদ জেনানা। বাহবা ঔর হাত-তালি ভি বহুং দিয়া, লেকিন ক আদমি মনমে ভাবা হ্যায় এ খেল্‌ হামারা ক্যায়সা অসাধ্য সাধন হ্যায়? দিনকে বাদ দিন, হপ্তাকে বাদ হপ্তা, মাহিনাকে বাদ মাহিনা, বরষকে বাদ বরষ, খানা নেহি, পিনা নেহি, গোশল নেহি, ঘুমানা নেহি, হাম তামাম শরীরকা খুন পানি করকে হামারা ডংকিকো ডংকি অ্যাক্ট সিখায়।”

“ঔর ডংকি জব খেল সীখ্‌কর ওস্তাদ বন গিয়া,” বললেন শেঠ কিশোরলাল ভরদ্বাজ, “তব সার্কাসমে খেল দিখানা শুরু কিয়া গ্রেট ডংকি ঔর গ্রেট মিস রেবেকা।”

বছরের পর বছর রক্ত জল করা নেপথ্য সাধনা তাঁর, আর প্রকাশ্য খেলায় বাহবার উচ্ছ্বসিত উল্লাস রূপবতী র্যোবনবতী রেবেকার। এজ্ঞাত কি হুংখ বা জঁর্ষা আছে প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোর চেতন বা অবচেতন মনে? অথবা তাঁর সাধনার ফুল রূপসী রেবেকার রাতুল পাদপদ্মের সার্কাসী নাগ্‌রাই-র তলায় ছড়ানো দেখেই তাঁর আনন্দ?

“রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা!” প্লুত স্বরে একটি নাম তিন-বার উচ্চারণ করলেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। বোঝা গেল না এ তাঁর পুলকোচ্ছ্বাস, না আর্তনাদ। যাই হোক, অতর্কিতে আবেগ প্রকাশ করে ফেলে সার্কাস-সম্রাট ট্যাল্পেট্রো বোধকরি একটু

অবস্থি বোধ করলেন। সেটা বুঝতে পেরেই শেঠজী “আপকা সার্কাস বজালকা, তথা ভারতকা গৌরব হায়, ইয়ে বাত্‌ সচ হায় ট্যাল্পেট্রোজি। ঔর মিস্‌ রেবেকা ইত্নি বড়ী আর্টিস্ট, ইয়ে ভী তো খুদ আপকা হী বাহাহরি। গন্ধা, ঔর রেবেকা, দোনোকো তো খুদ আপনে হী ট্রেনিং দেকর আর্টিস্ট বনায়। অতী উও গন্ধা ভাগ গিয়া, কেঁও কি অ্যায়সা হী লিখা ছয়া থা। তগ্‌দিরকা কলম অ্যায়সা হী জ্বরদন্ত, ট্যাল্পেট্রোজি।” ভবিতব্যের কলম কেউ রোধ করতে পারে না, এই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন হিন্দী ভাষায় পরিবেশন করলেন শেঠজী। মনে হল এই -তত্ত্বের সত্যতা তিনি উপলব্ধি করেছেন নিজেরই জীবনে।

শেঠজীর কথা শুনে প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোর হৃদে চোখে ছল ছল ভাব আরো প্রবল হয়ে উঠল। মনে হলো তাঁর বৃকের ভেতর ধ্বনিত হয়েছে চলেছে একটি মিঠে নাম বার বার : রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা! রেবেকা!

গম্ভীরভাবে ট্যাল্পেট্রোর সার্কাসের সর্বশেষ পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করলেন শেঠজী। রেবেকা ছিল ‘লায়ন-টেমার’, সিংহ-দময়ন্তী—পটল তুলেছে সেই সিংহ, পূর্ণ হয়নি তার স্থান। ‘গ্রেট ডংকি অ্যাক্ট’ দেখাত রেবেকা, সেই ডংকি পালিয়ে গিয়ে কোন মন্তরে অফিসার হয়ে বসেছে কে জানে? তাকে এখন দেখলে হয়তো সন্দেহ করা যাবে, কিন্তু চিনে প্রমাণ করা যাবে না। এখন করবে কি রেবেকা? শেষে যদি বিরক্ত হয়ে ‘হুস্তোর’ বলে এক দিন ভেগে যায়?

“নেহি নেহি নেহি নেহি নেহি।” বলে চীৎকার করে প্রায় কেঁদে উঠলেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। মনে হলো শেঠজীর এই অসন্তক এবং অনিচ্ছাকৃত নির্ধন খোঁচায় প্রফেসরের হৃদয় চারখানা ফদর তন্ত্রী ছিঁড়ে গেছে যেন।

“নেহি নেহি নেহি নেহি নেহি।” বললেন গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসের গ্রেট প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো, শেঠজীর মুখে উচ্চারিত অন্তর্ভুক্ত ইঙ্গিত সহিতে না পেরে। অনেক ছোটদের আর অনেক ছেলেমানুষ বড়দের মনে যেমন আতঙ্ক যেখানে ধারণা থাকে সন্ধ্যাবেলা সাপের নাম মুখে আনলেই সাপ আসে, ভুতের নাম মুখে আনা মানেই ভুতকে ডেকে আনা, ট্যাল্পেট্রোর বুদ্ধি তেমনি ভয়, রেবেকার পলায়ন সম্ভাবনার কথা মুখে বা মনে আনলেই সে সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হবে। সার্কাস-সর্বস্ব ট্যাল্পেট্রো রেবেকাহীন সার্কাসের কল্পনামাত্রেই শিউরে উঠলেন। আতর্কণ্টে হাহাকার করে উঠলেন “নেহি নেহি নেহি নেহি নেহি।”

অনুশোচনায় লজ্জিত, দুঃখিত, মর্মান্বিত হয়ে শেঠজী বলে উঠলেন “সিয়ারাম! সিয়ারাম! সিয়ারাম! আপ কেঁও পরেশান হো রহে হ্যায় ট্যাল্পেট্রোজি? সার্কাস-কী-রাণী কভী সার্কাসসে ছুট কর যা সক্তী হ্যায়? আপ নিশ্চিন্ত রহিয়ে, আপকা ইয়ে দোস্ত কিশেণলাল যবতক জিন্দা রহেগা। তবতক রেবেকা সার্কাসসে কভী নেহি ছুটেগী, এহী হ্যায় সিয়ারামজীকী ইচ্ছা। জয় সিয়ারাম! জয় সিয়ারাম! জয় সিয়ারাম!”

“আপকা মুখমে কুল চন্দন গিরেগা শেঠজি।” প্রাণে পরম শান্তি এবং ভরসা পেয়ে বললেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। “লেকিন সার্কাসকা সিংহ মর গিয়া, ডংকি ভাগ গিয়া, পটল তুল লিয়া সার্কাস-চেম্পিয়ন ফার্নানডেজ, গঙ্গা পা গিয়া হামারা কেটোখন, আভি এ ভাঙ্গা হাটমে মিস রেবেকা কোন্ আকর্ষণমে রহেগা?”

“ইস জমানেমে যো আকর্ষণ সবসে জবরদস্ত হ্যায়। চাঁদিকা আকর্ষণ।” বললেন শেঠ কিশেণলাল। “ইস মহিনেমে সুন্দরীকা তন্থা আপ ডিন হাজার কর দিজিয়ে। চেক হম দে গেছে। আজহী ভেজ দিজিয়ে রেবেকাকে পাস। সুন্দর চত্বে এক চিঠি ভি লিখ

দিজিয়ে ।”

“চিঠি ? কেয়া চিঠি লিখেগা হাম ?” বিস্মিত হয়ে বলে উঠল প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো, যেন অপ্রত্যাশিত অভাবিত ভাবে ধরা পড়া গেছেন শেঠজীর কাছে । “কেয়া লিখেগা হাম রেবেকাকো ?”

“দিলকী মিঠি মিঠি বাত্বে ।” বললেন শেঠজী । মনে হলো মিঠি মিঠি হাসির রেখা শেঠজীর মুখে দেখা দিয়েছে যেন । সে হাসি দেখে প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো আবেগে প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন “শেঠজি, আপ অন্তর্ধামী হ্যায়, হামারা মনকা গোপন বাত আপ পকড় লিয়া ।”

এইবার শেঠজীর বিস্মিত হবার পালা । শেঠজী বিস্মিত হলেন ।

সুখালেন “ম্যায়নে আপকী কোন সী বাত পকড় লিয়া ট্যাল্পেট্রোজি ?”

প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো বললেন “এ আপ ছলনা করতা হ্যায়, শেঠজি । আপ সাচ্চা টের পায়া হ্যায় হাম রেবেকাকা প্রেমমে গির গিয়া ।” বলে আবেগে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন ।

“হাঁ শেঠজি । হাম রেবেকাকা প্রেমমে গির গিয়া ।” বলতে লাগলেন তারপর জ্বলনবাধাগ্রস্ত কণ্ঠে । “আভি যব আপ পুরা টের পা গিয়া তব আউর গোপন করকে কেয়া হোগা ? দিল উন্মুক্ত করনেমে হাম আউর লজ্জা নেহি করেগা ।”

হয়তো নিজের অতীত জীবনের কোনো গভীর প্রেমের স্মৃতি মনে পড়ে গেল শেঠজীর । তিনি ক্ষণিকের জন্তে চোখ বুজে ভাবগভীর কণ্ঠে বললেন “প্রেম এক অজীব, পবিত্র ঐশ্বর স্বর্গীয় চীজ হ্যায়, ট্যাল্পেট্রোজি । ইসমে শরমকী কোঈ বাত নেহি । লেকিন—”

এই কিস্তিতে এসে থেমে গেলেন শেঠজী, ইতস্তত করতে লাগলেন । প্রেমের হাবুডুবু ভঙ্গুরত ট্যাল্পেট্রোর কানে প্রেম সম্বন্ধে তাঁর

কিন্তু-বচন শোনানো বাঞ্ছনীয় হবে কি না।

“লেকিন কেয়া, শেঠজি?” আকুল কৌতূহলে প্রশ্ন করলেন ট্যাল্পেট্রো।

প্রেম-তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ এসেছে প্রেমজর্জর প্রফেসরের আপন মুখ থেকে। তাহলে আর দ্বিধা কিসের?

শেঠজী বলতে লাগলেন “প্রেম অতি মধুর হায়, প্রেম অতি কঠিন হায়। প্রেমমে অম্মুং হায়, প্রেমমে জহর ভী হায়। প্রেমমে হাঁসনা হায়, ফির রোনা হায়। প্রেমমে যিতনা পুলক, উতনা হী জ্বালা। প্রেমমে ফস্ যানা এক বড়ে ঝমেলমে ফস্ যানা। প্রেমকী শীতল সরোবর, প্রেমকী মনোরম ফুলোঁসে ঔর ফুলোঁসে ভরা ছয়া বাগিচা, প্রেমকা তারে-চমকীলী আস্মান, প্রেমকা—”

কিন্তু ‘প্রেমকা’ আর কি কি আছে তার ফিরিস্তি দিতে পারলেন না শেঠজী, কারণ তার আগেই একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। যাকে বলা যায় ডুক্রে কেঁদে ওঠা, কণ্ঠ ছেড়ে কাঁদা। কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন “মর যায়গা, মর যায়গা, হাম বিলকুল মর যায়গা শেঠজি।” বলে বোধকরি মৃত্যু-যজ্ঞণা চাপবার চেষ্টায় দুটি হাতে মেডেল-শোভিত বুক চেপে ধরলেন।

শেঠজী বললেন “মরনা তো এক রোজ জরুর হী হায় ট্যাল্পেট্রোজি, মগর ইতনী জলদি কেঁও? আপ, গ্রেট প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো; বঙ্গালকে এক মহান গৌরব হায়। ঔর কমসেকম বিস পঁচাস সাল জীনা তো আপকা অবশ্যহী উচিত হায়।”

আমিও বললাম “বাঙলা আর বাঙালীর মুখ চেয়ে আপনার সত্যিই আরো বিশ পঞ্চাশ বছর বাঁচা উচিত। অন্তত বিশ বছর তো বটেই।”

আমার অস্তিত্ব হয় তো আবেগের জোয়ারে ভুলেই গিয়েছিলেন

ট্যাল্পেট্রো। এইবার আমার কথায় খেয়াল হওয়াতেই তিনি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শেঠজীর দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমাকেও শুনিye বললেন “হাম বাঙ্গালীকা গৌরব, এ বাত কয়ঠো বাঙ্গালী জানতা? প্ল্যাকার্ড, পোস্টার, সাইনবোর্ড ঠর হাওবিলমে ঢাক পিটাকে জানান পড়তা হয়। ঢাক পিটানা খতম তো গৌরব ভী খতম।”

অবাক হয়ে তাকালাম প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোর মুখের দিকে। একটি কথায় তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর অন্তরের একটি জানালা ভেতরের দিকে খুলে দিলেন। ঢাক পিটানা খতম তো গৌরব ভী খতম! হায়রে ঢাক পিটিয়ে অর্জন করা, ঢাক পিটিয়ে বাঁচিয়ে রাখা গৌরব!

“রেবেকাকা প্রেম নেহি পানেসে হাম কলিজা ফাটকে মর যায়গা শেঠজি।” বলতে লাগলেন চোখ মুছতে মুছতে প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। “হাম কায়সে কহেগা হামকো কেয়া হো গিয়া? শয়নমে রেবেকা, স্বপনমে রেবেকা, উঠনেমে রেবেকা, বৈঠনেমে রেবেকা, ঘরমে রেবেকা, বাহারমে রেবেকা। শেঠজি, হাম পাগল হো যায়গা।”

শেঠজী ভক্ততার স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন “আরে নেহি, নেহি। পাগল কহীঁকা!”

“রেবেকাকা লিয়ে হী হাম ফার্মানডেজকো হারায়, হামারা কেঠো-ধনকে হারায়। আভি রেবেকাকো হারানেসে হাম মর যায়গা শেঠজি।”

“আপকে দিল্‌সে রেবেকা কভী নহী ভাগ্‌ যা সকেগী ট্যাল্পেট্রোজি। আপ সবড়াইয়ে মং। আপকী যো কহানী কল্‌ হমকো সুনাতো রহেঁ থেঁ, আভি ধনপতিবাবুকো ভী জরা সুনাইয়ে। আপকী হালৎ ঠর পরিস্থিতিকে সাথ পরিচিত হোকর ধনপতিবাবু ভী কুছ সলা আপকো দে সকেজে।”

শেঠজীর অমুরোধ রাখতে—হয় তো বা আমার কাছ থেকে কিছু শলাপস্বাক্ষর লাভ করবার লোভেও—অম্বকাহিনী শোনাতে শুরু

করলেন প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। সে কাহিনী তাঁরই ভাষায় লিখে রাখছি।.....

ছিলেম ভজ্জহরি তলাপাত্র। সার্কাসী ব্যবসার খাতিরে হতে হলো বিলিতি কায়দায় বি ট্যাল্পেট্রো। তারপর নামের আগে একটা ‘প্রফেসর’ লাগিয়ে প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো। জানেন তো, ভেক না হলে ভিখ মেলে না, আর গেরো যোগীও ভিখ পায় না?

পয়সা মন্দ কামাইনি আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে, বেঁচে থাক আমার বাঙালীর গৌরব গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস। অবিশি এখন আর তেমন কামাই হচ্ছে না, বাজার ভারী মন্দ। ছেলে বুড়ো মেয়ে মন্দ। সবাই ফিলিমে ফিলিমে ভূত-পেঙ্গীর নেতা দেখছে, সার্কাসের মর্দানা তামাশা তাদের সহবে কেন?

তার ওপর দেখুন ছটো সিংহ পট্‌পট্‌ করে মরে গেল। আবার যে নতুন এনে তাদের ফাঁক ভরাবো তেমন ভরসা পাচ্ছি নে। বাজার মন্দা, সিংহ কেনার টাকাই উত্তুল হবে না হয়তো।

সিংহ ছটোর কিন্তু অমন সাত তাড়াতাড়ি পটল তোলার কথা নয়, এমন কিছু ব্যস হয়নি। আর খাওয়া দাওয়ায় ওদের যা যত্ন আত্তি করতুম, মনিগ্রির অমন যত্ন হয় না। ব্যাটারা নেহাৎ নেমকহারাম, তাই মরে গেল।

অবিশি, ওদেরি বা দোষ কি? ওরা জানোয়ার, জানোয়ারের মতো বেঁচেছে, জানোয়ারের মতই মরে গেল। আমাকে জব্দ করার জগ্লেই যে, তা নয়। বিবেশ করুন আপনি।

সিংহের খেলা শেষ দেখাতো রেবেকা। দেখেছেন তো রেবেকাকে? আশ্চর্য মেয়েটা। সার্কাসটাকে তো আজকাল ওই একরকম—একরকমই বা বলি কেন, পুরোপুরি—বাঁচিয়ে রেখেছে। সিংহ মরে গেছে, তবু রেবেকা আছে, তাই আপনারা মশাই রেবেকাকেই দেখতে আসেন।

দেখবার জিনিস বটে। চোখ পড়লে চোখ ফেরানো শক্ত। হরদম তাই ভয়ে ভয়ে থাকি কোনো ফিল্ম কোম্পানী না ওকে ফুস্লে ফাস্লে ভাগিয়ে নিয়ে যায়, বা ও-ই নিজের ভেগে না যায়। মেয়েটা গান গাইতে পারে না বটে, কিন্তু গানতো আড়ালের গাইয়ে দিয়ে গাওয়ানো হচ্ছে আজকাল। আসল যেটি দরকার সেটি রেবেকার আছে।

এই রেবেকাকেই নিয়ে তো ফার্নানডেজের সঙ্গে আমার মনান্তর হয়ে গেল। ও, ফার্নানডেজের কথা আপনাকে বলিনি বুঝি? ওকে ছোটো করে ডাকতুম ফার্নান বলে। ও আর রেবেকা এই দুজনেই ছিল আমার সার্কাসের জোড়ামাণিক, যাকে আপনারা বলবেন স্টার আর্টিস্ট। রেবেকার অনেক খেলা—আসল আসল খেলাগুলোই ফার্নানের কাছে শেখা। ফার্নান জ্ঞাতে ছিলো গোয়ানিজ কিনা জানিনে—আমাদের সার্কাসে জ্ঞাত বিচারের কোন বালাই নেই, বামুনও যা শুদ্ধুরও তাই। ফার্নান ছিলো সার্কাস খেলোয়াড়দের রাজা। আহা হা, ফার্নান বেঁচে থাকতে ট্যালপেট্রোর সার্কাস দেখেননি আপনি! ছনিয়ার সেরা শক্ত শক্ত খেলা দেখাচ্ছে না যেন নশ্টি টানছে। এক চুল এদিক ওদিক হয়েছে কি মরেছে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাঁ হয়ে দেখতো সবাই। খাঁটি কথা বলতে গেলে, ফার্নানই আমার সার্কাসকে তুলে দিয়ে গেল—ফার্নান আর রেবেকা।

খেলা দেখাতে আর খেলা শেখাতে সমান ওস্তাদ ছিলো ফার্নান। ভেতরে মশলা না থাকলে অবিশ্রি মাল বানিয়ে তোলা যায় না—তবু বাহাদুরী আছে ফার্নানের, একথা একশোবার বলবো। অদ্ভুত শেখালে রেবেকাকে, যেন যাচ্। ভুতুড়ে যাচ্। আমি ভাবতুম শেখাচ্ছে শেখাক, ভালোই তো। খুশীই হতুম। খেলা দেখাবার জন্তেই যা মাইনে দিতুম ফার্নানকে, খেলা শেখানোর জন্তে এক আধলাও নয়। ফার্নান যদি বিনি মাইনেতে রেবেকাকে সব সেরা সেরা খেলা এক এক করে শিখিয়ে পাকা করে দেয় তো মন্দ কি? শেখাচ্ছে, শেখাচ্ছে ফার্নান রেবেকাকে, আমি

যেন দেখেও দেখছি না।

কিন্তু শেখটার বাড়াবাড়ি শুরু করলে ফার্মান। বাড়াবাড়ি যে করবে সে আমার আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল, কিন্তু করিনি। আমি আবার—কি জানেন? মাঝে মাঝে এক গবেট মার্কী হয়ে যাই।

ক্রমে ক্রমে দেখলুম রেবেকাকে শেখানোর চাইতে ফার্মানের বেশী নজর রেবেকার ওপর। রেবেকাকে খেলা শেখানো আসলে রেবেকাকে বাগাবার ফন্দি ছাড়া কিছু নয়। দেখতে যাকে বলেন সুপুরুষ, সেটি ছিলো না ফার্মান, পুরুষ্ট হলে কি হবে? বরং কুপুরুষই বলা যেতো তাকে। আর সেই জগ্গেই বোধ করি অমন অদ্ভুত ভালো খেলোয়াড় হতে পেরেছিলো ফার্মান, একলব্যের মতো সাধনা করে। কেন? না, চেহারা দেখিয়ে সুন্দরীর যে-মন মিলবে না, খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে তাই পেতে হবে। রেবেকা সুন্দরীকে দেখে তার মন মজে গেল। কিন্তু শুধু মজলে তো হবে না, মজানোও যে চাই। নিজে খেলোয়াড়নী রেবেকা, শুধু খেলা দেখিয়ে হয়তো তাকে মজানো যাবে না, এই জগ্গেই তাকে খেলা শেখাবার রাস্তা ধরলে ফার্মান।

সার্কাস দলের লোকেদের ভেতর কানামুখে শুরু হলো, তার ছুটো চারটে কথা পৌঁছলো এসে আমাদের কানে। শুনলুম ফার্মানের মতলব সে বিয়ে করবে রেবেকাকে। রেবেকা নাকি মাথা নেড়েছে। মাথা নাড়ার মানে অস্বীকার না-ও হতে পারে, হ্যাঁ-ও হতে পারে, কিন্তু হ্যাঁ-ও যে হতে পারে তাই ভেবে মনটা চট করে শিউরে উঠলো। শাস্তোরাই তো বলেছে মশাই মুনিদেরও মতিভ্রম হয়; তাহলে মেয়েদেরই বা হতে বাধ্য কি? কতো খাসা সুন্দরী মেয়ে ভুতুড়ে চেহারার সঙ্গে প্রেম করে তো আক্কাছার পালাচ্ছে। তারপর কি হচ্ছে সে আলাদা কথা। কিন্তু পালানোটা তো আপনি আটকাতে পারছেন না।

ফার্মান-চরিত্র আমি কিছু কিছু জানতুম। পুরোপুরি নখদর্পণে

ছিলো একথা অবিশ্টি বলতে পারিনে। বাচ্চা ভারী ভালোবাসতো ফার্গান। এক কালে সেও বাচ্চা ছিল, সেই জন্তে নয়, এককালে বাচ্চা তো আমরা সবাই থাকি, বাচ্চা-পিরিত আর ক'জনের থাকে ? কিন্তু বাচ্চা-পাগল বলা যেতো ফার্গানকে। সার্কাসের অনেক পাশ দিয়েছে অনেক বাচ্চাকে, যাদের সার্কাস দেখবার শখ ছিলো, টিকিটের পয়সা ছিলো না। যে সব দিনে কম্প্লিমেন্টারি পাশ একদম বন্ধ করে দেবার কড়া নোটিশ দিতুম, ফার্গান সে সব দিনে নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে টিকেট কিনে দিতো অনেক বাচ্চাকে। ভাবলুম রেবেকাকে বিয়ে করলেই ফার্গান বছর না ঘুরতেই মা বানিয়ে ছাড়বে রেবেকাকে, তারপর বছর বছর। তখন বাচ্চাই সামলাবে, না সার্কাসের খেলাই দেখাবে রেবেকা ? আর রেবেকা না থাকলে সার্কাস যে কানা হয়ে যাবে আমার। রেবেকার অভাবের খাঙ্কা ফার্গান সামলে দিতে পারবে না—লোকে তার শিউরে-তোলা তাক-লাগানো খেলা দেখে যতই বাহবা দিক, তাদের মন তবু কাঁদবে রেবেকার জন্তে। সার্কাস-পিয়াসীরা তো শুধু খেলা দেখতেই আসে না, খেলা যে দেখায় তাকে দেখতেও আসে। নইলে, আমার সার্কাসে এককালে ছিলো রুক্মা বাঈ—শুধু খেলার দিকে দেখতে গেলে রুক্মার কাছে রেবেকা নাবালিকা। কিন্তু রুক্মা আসর জমাতে পারেনি, আর রেবেকা নইলে আসর জমে না। এই রেবেকাকেই সার্কাস থেকে সরিয়ে নিতে চায় ফার্গানডেজ ! আক্কেলটা দেখুন একবার ! আরে বাপু, এই যদি তোর মতলব তবে এত করে সার্কাসী শক্ত শক্ত খেলা শিখিয়ে তৈরী করার দরকারটা ছিলো কি ? ঘরকন্না করার মেয়ে তো ঘরে ঘরে ফ্যা ফ্যা করছে। আর রেবেকার মত সার্কাসী মেয়ে লাখে একটার বেশী মেলা ভার। কাচ্চা বাচ্চার মা হয়ে ঘরকন্না করবার জন্তে তো আর সার্কাসের খেলা রপ্ত করবার দরকার হয় না।

ভাবলুম রুখে দিতে হবে এই বেলা। নইলে রেবেকার বারোটা বাজিয়ে ফার্গান আমার সার্কাসের বারোটা বাজাবে। একদিন চুপি চুপি

ডাকলুম ফার্নানকে । ডেকে এমন ভাব দেখিয়ে গোসা করলুম যেন ফার্নান যে রেবেকাকে খেলা শেখাচ্ছে তা আমি অ্যাঙ্গিন দেখিনি, এইবারে হঠাৎ টের পেয়ে গেছি । বললুম, এভাবে আমাকে না জানিয়ে চুপি চুপি খেলা শেখানো চলবে না ।

ফার্নান চমকে উঠে বললে ‘সেকি ওস্তাদ ?’

আদব জানতো বটে ফার্নান । সে আমি মশাই একশোবার বলবো । ছোকরা আমার ওস্তাদের ওস্তাদ হবার লায়েক হয়েও আমার ওস্তাদ বলতো । কেন ? না আমি দলের মালিক, দলের সর্দার ।

চমকে উঠলে বলেছি না ? হ্যাঁ, চমকেই উঠলে ফার্নান । প্রাণ ঢেলে খেলা শিখিয়েছে আমার দলের সেরা খেলোয়াড়নীকে, এক আধলা মজুরির দাবী জানায়নি ; আশা করেনি তার জন্তে । কোথায় আমি খুশী হয়ে পিঠ চাপ ডাবো, বখ্শিশ দেবো, তা নয় আমি গোসা করছি । তাজ্জব !

ওর মুখ দেখে মশাই প্রাণটা ঝাঁ করে নরম হয়ে উঠলো । তখখুনি ভাবলুম, না, নরম হলে চলবে না । গরম হতে হবে । নইলে আমার সাজানো সার্কাস গুঁকিয়ে যাবে ।

বললুম ‘আমার সার্কাসে আমার হুকুম ছাড়া কিছু চলবে না ফার্নান ।’

ফার্নান বললে ‘বে-খেয়ালে অপরাধ করে ফেলেছি ওস্তাদ, ঘাট মানছি আমি ; এবার হুকুম দাও আমার বাকী সবগুলো খেলা আমি রেবেকাকে শিখিয়ে দিই । ছনিয়ার সেরা সার্কাস-খেলোয়াড়নী আমি বানাবো ওকে ।’

যে চোখে তাকিয়ে সে সিংহদের কাবু বানিয়ে রাখতো, সেই চোখে তার দেখলুম মেঘলা আকাশের আড়ালে জ্বলছে ভালোবাসার আগুন । রেবেকাকে ভালো বেলেছে ফার্নান, রেবেকার জন্তে ভালোবাসায় ওর পা থেকে মাথা তক সবগুলো রক্ত টগবগ করে ফুটছে । ঐ ভালোবাসার

গাছে ফুল ফুটলে ফল ধরলে আমার সার্কাসের লোকমানের কথা ভেবে
আমারো রক্ত টগবগিয়ে উঠলো রাগে আর ভাবনায় ।

আমি বললুম ‘অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে ফার্নান, আর নয় ।
খেলা দেখাতে আর খেলা শেখাতে তুমি জানো তা মানি, কিন্তু কাকে কি
খেলা শেখানো উচিত সেইটে তুমি জানো না । যে সব শক্ত খেলা
পুরুষের শরীরে চলে, তার সবগুলো মেয়েদের শেখানো যদিও বা যায়,
তার ফল ভালো হয় না ফার্নান ! তুমি জানো না, রেবেকাও বুঝতে
পারছে না, তুমি তার সর্বনাশ করছো । তাই তোমায় হুঁশিয়ার করে
দিচ্ছি, তুমি আর কোনো খেলা শেখাবে না রেবেকাকে ।’

জানি নে কি ভাবলে ফার্নান, কিন্তু আমার হুকুম সে মাথা পেতে
নিলে । রেবেকার বন্ধ হয়ে গেল নতুন খেলা শেখা । কিন্তু বন্ধ হলো
না দেখাশোনা, কথাবার্তা, মেলা-মেশা । অথচ ওটা বন্ধ করা দরকার ।
এমনিতেই রেবেকার মনের ভেতর ফার্নান কতটা সঁখিয়ে বসে আছে
কে জানে ? সুবিধে পেলে যে আরো জাঁকিয়ে বসবে, আর তারপর
যা হবার হবে ।

মেয়ে জাতকে তো জানি মশাই, যা বলা যাবে তার উল্টোটি করতে
চাইবে, পূবে যেতে বললে জেদ ধরবে পশ্চিমে যেতে । রেবেকাকে তাই
বললুম না কিছু । ফার্নানকে একদিন আড়ালে ডেকে বলে দিলুম মেয়ে
খেলোয়াড়দের সঙ্গে ও যেন আর আড্ডা না জমায় । একটু ভয় ছিল
বটে, ফার্নান রাগ করে চলে যেতে চাইতে পারে । কিন্তু চাইলেই তো
আর হলো না—আমার কাছে আরো তিন বছরের কণ্ট্রাক্টে বাঁধা ফার্নান,
একেবারে নট নড়ন চড়ন কণ্ট্রাক্ট । তা ছাড়া জানি তখন ফার্নান চলে
গেলেও আমার সার্কাস টল্বে না, এক রেবেকার দামই লাখ টাকা ।
তার ওপর ফার্নান সেরা সেরা খেলায় রেবেকাকে পোক্ত করিয়ে দিয়ে
রেবেকার দাম দিয়েছে আরো বাড়িয়ে । সার্কাস ছেড়ে ফার্নান চলে গেলে
বরং খুশীই হতুম । মানে, এক হিসেবে খুশী আর কি !

কিন্তু এমনিতে না হয় গুজুর গাজুর ফিসির ফান্সর বন্ধ করলুম, সার্কাসের প্রোগ্রামে ওদের এক সঙ্গে খেলা তো আর বন্ধ করতে পারিনে! ভাবলুম আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে যা হোক। ফার্নানের সঙ্গে কয়েকটা চমকদার ট্র্যাপিজের খেলা আর হরাইজনট্যাঙ্ক বারের খেলা ছিল রেবেকার। ঐ খেলাগুলোর জন্তে পাগল হয়ে উঠতো সব সার্কাস দেখিয়ের দল। যেন আমার প্রোগ্রামের আর সব খেলা এদের কাছে ছেলেমানুষ। এদের খেলা কত যে হাততালি আর কত যে এনকোর পেয়েছে, কি আর বলবো আপনাকে?

ওদের জোড়া খেলার সময় চেয়ে দেখতুম রেবেকার দিকে, ভালোবাসার ছাপ পড়ছে কিনা ওর চাউনিতে, ওর হাসিতে, ওর হাবে ভাবে। রকম দেখে গতিক বড়ো স্তবধে মনে হলো না। ভাবলুম, কথায় বলে মন না মতি, টলতে কতক্ষণ?

মনে মনে কুন্দি আঁটতে লাগলুম। ফার্নান হয়ে উঠেছে রেবেকার জন্তে পাগল, একেবারে বন্ধ পাগল, ছুনিয়ার তামাম চিকিচ্ছের বাইরে। বিধিয়ে তুলতে হবে রেবেকার মন! যেন রাগে ঘেঁষায় মনে মনে লাখ মেরে ফার্নানকে দূরে সরিয়ে দেয় রেবেকা, রেবেকার মনে আর কোনদিন যেন ঠাই না মেলে ফার্নানের।

মিলে গেল মণ্ডকা। ভগবানই যেন পাঠিয়ে দিলেন। সার্কাসের তাঁবু পড়লো এক রেল ইস্তিশান থেকে খানিক দূরের ময়দানে। ইস্তিশানের কাছাকাছি এক সরাইখানা, খাসা সরাইখানা। খানা যেমন মেলে, পিনাও তেমনি—দিশি, বিলিতি যেমনটি চান। রাত কাটাতে চান, তাও কাটাতে পারেন। পিয়ালা, সাকী, কিছুরি অভাব হবে না। তবে হ্যাঁ, রেস্তো খসানো চাই। দেখে মনটা চট করে খুশী হয়ে উঠলো।

দরাজ হাতে রেস্তো হাতে গুঁজে দিয়েই সরাইখানায় পাঠিয়ে দিলুম ফার্নানকে। বললুম, যাও একটু খানা পিনা করে মন হালকা করে এসো ফার্নান। এমন সরাইখানা চেখে আর দেখে না এলে পস্তাবে।

গেল ফার্গান। পড়ে গেল সরাইখানার সাকীর পাল্লায়। নাম কিছু একটা ছিলো নিশ্চয় মেয়েটার; সবাই ডাকতো সাকী বলে।

ভারী বেলেল্লা বে-আক্ৰ মেয়ে! দেমাক করে বলতো, ও ভেড়া বানাতে পারবে না যাকে, এমন মরদ আজ্ঞো জন্মেনি।

আমি চুপি চুপি বলেছিলুম, তা বেশ! আমার সাকীসের ফার্গানকে পাঠাচ্ছি। দেখি তাকে কেমন তুমি ভেড়া বানাতে পারো।

ভেড়া বানাতে বটে মেয়েটা। ফার্গানকে বিলকুল ভেড়া বানিয়ে ছাড়লে। রেবেকার সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্তে আকুল পিয়াসায় ওদিকে ফার্গান-কেষ্টোর কল্‌জ্ঞে ফেটে যাচ্ছে, আর এদিকে আমি মশাই জটিলে কুটিলের মত রেবেকা-রাইকে পাহারা দিচ্ছি।

পাহারা দিচ্ছি; ওদের পিরিত জমাবার রাস্তা আগলে বসে আছি বললেই হয়।' মানে, আসল কথা, রেবেকাকে আগলে বসে আছি, যেন রেবেকা-চাঁদকে ফার্গান রাছ গিলে না ফেলতে পারে। ফার্গান বেচারার বৃকের বয়লারে মশাই পিরিতের ইস্টীম কেঁপে কেঁপে উঠছে, কোনো স্বন্দরীর পায়ের তলায় সে ইস্টীম না ঢালতে পেলে বয়লার যে ফেটে যাবে চোঁচির হয়ে। ফার্গান বেচারা করেই বা কি? সরাইখানার সাকীকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে যেন।

তাই এক এক সময় কি মনে হয় জানেন? আসলে ইচ্ছে করেই ভেড়া বনেছিল ফার্গান, জেদ করে, গায়ের ঝাল মেটাতেও বলতে পারেন। বলিনে ফার্গান ছিলো ভীষ্মদেবের ব্যাটা ভীষ্মদেব, বেঙ্গাচারী পো বেঙ্গাচারী। কিন্তু রেবেকাকে আমি অমন আঠে পৃষ্ঠে আড়াল করে না রাখলে ঐ সাকীর বাবারও মুরোদে কুলোতো না ফার্গানকে টলাবার, ভেড়া বানানো তো দূরের কথা।

ফার্গান বোধকরি একটু চটেছিল, অভিমানও করেছিল রেবেকার ওপর, কেন সে বোঁকে বসেনি, কেন বলেনি আমার মুখের ওপর, 'ফার্গানের সাথে মেলামেশা আমি করবোই, সে আমার খুশি।' সত্যিই ওকথা

বললে আমি নাচার। রেবেকার হাতের তলায় আমি। রেবেকা রাগ করে সার্কাস ছেড়ে দিলে আমার সার্কাসের দফা গয়া। কিন্তু অমন কথা বলেনি রেবেকা। কি জানেন? এখন ভেবে দেখছি হয়তো রেবেকার মন মজেনি ফার্নানের ওপর। আসলে আধো আধো পিরিতের ভান করে ভুলিয়ে ভালিয়ে ফার্নানের ভাঁড়ার থেকে সেরা সেরা খেলাগুলো হাতিয়ে নিচ্ছিল। নইলে পিরিতের আগুন বৃকে জ্বললে মেয়েমানুষ কি আর অত সহজে মনের মানুষের সাথে মেলামেশার মানা মেনে নেয়? বিশেষ করে রেবেকার মতো জাঁদরেল স্বাধীন জেনানা? এটা মশাই এখন বুঝছি, তখন বুঝতে পারিনি!

সরাইখানার বেলেন্সা মেয়েটার সঙ্গে ফার্নানের দহরম মহরমের খবরটা কানাঘুষোয় পৌঁছলো রেবেকার কানে। অবিশ্টি এই পৌঁছবার পেছনে আমারো কারসাজি ছিলো, বোধ করি আঁচ করে নিয়েছেন, চালাক মানুষ আপনি। আমার মতলব ছিলো রেবেকার মনটাকে ফার্নানের ওপর বিষিয়ে দেওয়া, সে তো বলেইছি আপনাকে।

খুব সম্ভব এই পৌঁছবার পেছনে ফার্নানের নিজেরও কারসাজি ছিলো। বেহায়া মেয়েটার সঙ্গে বেহায়াপনার বাড়াবাড়িটা ইচ্ছে করেই জাহির করেছিলো ফার্নান, যেন রেবেকার হিংসে হয় ঐ মেয়েটার ওপর, রেবেকার মনের মানুষকে ছিনিয়ে নিচ্ছে বলে। ভেবেছিলো হিংসে জাগিয়ে রেবেকাকে পুরোপুরি বাগাবে ফার্নান। রেবেকার আন্ধেক জেতা মনকে পুরোপুরি জিতবে।

কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে উল্টো বুকলি রাম হয়ে গেলো ফার্নানের পোড়া বরাতে। সরাইখানার বেলেন্সা মেয়েটার সঙ্গে ফার্নানের বেলেন্সাপনার খবর শুনে, আর এক দিন নিজের চোখে দেখে—ওকে দেখাবার ব্যবস্থাটা গোপনে অবিশ্টি আমিই কায়দা করে করিয়েছিলুম, নিজে আলগা থেকে—রেবেকা ক্ষেপে আগুন হয়ে বোঁকে বসলো। বললে ফার্নানের সঙ্গে বন্ধুত্ব তার গেল চিরদিনের

জন্মে খতম হয়ে ।

ফার্মানের কাছে খেলা শেখা তো আগেই বন্ধ হয়েছিলো । এইবার রেবেকা কথা কওয়াও বন্ধ করে দিলে ফার্মানের সঙ্গে । শুধু তাই নয়, সার্কাসের প্রোগ্রামে ফার্মানের আর রেবেকার এক সঙ্গে ছ' তিনটে খেলা ছিলো । সেই খেলাগুলোও রেবেকা আর দেখাতে রাজী হলো না । মানে, কোনো সম্পর্কই আর রাখবে না ফার্মানের সঙ্গে । ফার্মানের যে অবস্থা হলো কহতব্য নয় । ওর অবস্থা দেখলে শেয়াল কুকুরেরও কান্না পেতো । আমার শক্ত চোখেও কেমন একটা ছল ছল ভাব এসে গেল ।

কিন্তু রেবেকা তার জেদ থেকে এক চুল নড়লে না । ফার্মানের সঙ্গে তার যে জুড়ি বেঁধে খেলাগুলো ছিলো, তাদের বদলে সে দেখাতে লাগলো নতুন গুটিকতক একা একা খেলা—সবই অবিশিষ্ট ফার্মানের কাছে শেখা । ফার্মান হয়তো মনে মনে বললে 'বেইমান !' কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলে না । সরাইখানার সেই বেহায়া মেয়েটার পাল্লায় পড়ে বেহায়াপনা করে রেবেকার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে শরমে একেবারে মরমে মরে ছিলো বেচারী ।

আসলে রেবেকার ব্যাপারটা কি জানেন ? মেয়েটা শুধু একটা অজুহাত খুঁজছিলো ফার্মানের সঙ্গে আড়ি করে দেবার । ফার্মানের মতলবটা সে টের পেয়েছিলো মানে ওকে বিয়ে করে বছর বছর মা বানাবার মতলব—আর ও মতলবটা তার পছন্দ হয়নি । দিনকতক একটু ভাব দেখিয়ে কতগুলো সেরা খেলা শিখে নিলে, তারপরই কাজ ফুরোলে পাজী ।

ফার্মান বোধকরি সন্দেহ করেছিলো রেবেকার মন ওর ওপর বিবিয়ে যাবার পেছনে আমার কারসাজি আছে । আমার দিকে ও এমন করে তাকাতে শুরু করলো যেন কাঁক পেলেই আমাকে সাবাড় করে তারপর নিজে সাবাড় হবে । একটু ভাবনা হলো বই কি ! খামকা বেঘোরে পৈতৃক প্রাণটা কে আর হারানতে চায় বলুন ? ভেবে দেখলুম সরিন্দে

দিতে হবে ফার্নানকে, যেমন করে হোক। কেউ কেউ বললে ফার্নান এবারে আত্মহত্যা করে না বসে।

কদিনের ভেতরই সার্কাসে এক সাংসাতিক কেলেকারি কাণ্ড। উঁচু ট্র্যাপিজের খেলা দেখাচ্ছে ফার্নান। ট্র্যাপিজের ডাণ্ডার ওপর মাথা রেখে পা ছুটো ওপরে চালিয়ে দিয়ে দোল খাচ্ছে, এমন সময় একদিকের দড়ি ছিঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঁচু থেকে একেবারে নিচে পড়ে গেল ফার্নান। তাঁবুর তলায় চারিদিকের সার্কাস দেখিয়েরা সবাই শিউরে উঠে চোঁচিয়ে উঠলো। পড়ার মিনিট কয়েকের ভেতরই মারা গেল ফার্নান—ঘাড় তার ভেঙে গিয়েছিলো। মুখে সে কিছু বলতে পারলো না, কিন্তু চোখ দিয়ে আমায় সে শাসিয়ে গেল। বলে গেল, ‘আমার মৃত্যুর জন্তে তুমি দায়ী। এর শোধ আমি নেবো। নেবো। নেবো।’

কবর দেওয়া হলো ফার্নানকে, একটু ঘটা করেই। রেবেকা হুঃ একটু পেল বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তও হলো বোঝা গেল। ফার্নান আর কখনো তাকে বিয়ে করবার দাবী জানাবে না।

এর পরের গল্পটুকুই আমায় কাঁদাবার গল্প। ফার্নানের পটল তোলার পর এক রাত্তিরে সার্কাসের খেলা। ফার্নান নেই, ফার্নানের এদিকে খেলা দেখাবার সময় এসে গেছে, পুরোনো রুটিন মতো। রেবেকা তৈরী হচ্ছে খেলা দেখাতে যাবার জন্তে, এমন সময় হঠাৎ দেখি কেণ্টোখন, আমার সবেধন নীলমণি ছেলে, সার্কাসের পোশাক পরে ধাঁ করে গিয়ে ট্র্যাপিজে চড়ে খেলা দেখাতে শুরু করে দিলে। আমার ভীৰু ছেলে কেণ্টো, আমার মা-হারা ছেলে কেণ্টো। নিজে নাগরদোলা চড়া তো দূরের কথা, অন্যকে চড়তে দেখেই যার মাথা ঘোরে। আমার সেই ছেলে অনায়াসে এক ফোঁটা না ঘাবড়ে উঁচু ট্র্যাপিজের সব চেয়ে শক্ত খেলাগুলো অনায়াসে দেখাতে লাগলো। হাততালি দিয়ে উঠলো সবাই। আশ্চর্য! ছবছ যেন ফার্নানই এসে আমার ছেলে কেণ্টোর চেহারার ছদ্মবেশ ধরে খেলা দেখাচ্ছে। ট্র্যাপিজে হুলতে হুলতে দেখি

হঠাৎ যেন তার মুখে খেলে গেল ফার্গানের মুখের ছবি।

আমার বুক কঁপে উঠলো এক অজানা ভয়ে। তবে কি ফার্গানই এসে কেঁটোর ওপর ভর করে খেলা দেখাচ্ছে ?

খেলা শেষ করে নেমে এলো কেঁটো। চারিদিকে হাততালি। হাসি-মুখে হাত তুলে নাড়াতে নাড়াতে সার্কাসের সাজঘরে চলে গেল কেঁটো। তার হাসির কায়দা, হাত নাড়া, চলার ঢং সব কিছুই ফার্গানের মতো। আমি গেলুম তার পিছু পিছু সাজঘরে। কেঁটো গিয়ে একটা চৌকির ওপর শুয়ে পড়লো। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠে বসলে। ওর ভাবাচ্যাকা ভাব দেখে মনে হলো সে যেন কি একটা বিস্ত্রী স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে।

পরদিন রান্তিরে ঠিক ফার্গানের খেলার সময়টাতে আবার ঠিক সেই ব্যাপার। কিছুতেই ধরে রাখা গেল না কেঁটোখনকে। সে যেন আলাদা মানুষ—কেঁটোখন নয়। ছবছ ফার্গানের মতো খেলা দেখাতে লাগলো। রাতের পর রাত এলি খেলা দেখায় কেঁটোখন, কিন্তু খেলা দেখাবার পর তার কিছু মনে থাকে না। রেবেকার মতো শক্ত মেয়ে পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে বললে ‘আমি এ ভালো বুঝছি না ওস্তাদ। এ ভুতুড়ে ব্যাপার। রোজা ডেকে বরং ঝাড়াও।’

অনেক খোঁজ করে একজন রোজা পাওয়া গেল, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না সে। ফার্গান শুধু সার্কাস দেখাবার সময়টা কেঁটোর ওপর ভর করে থাকে, তারপরই চলে যায়। কোনো ক্ষতি করে না—বরং সার্কাসের তাতে লাভই হয়।

আমি ভাবতে লাগলুম ‘বেশ তো। এ আর এমন মন্দ কি ? সার্কাসের খেলা দেখাবার আশ মেটেনি ফার্গানের, কেঁটোর ওপর ভর করে সে তার আশ মেটাচ্ছে। বিনি পয়সায় পাকা খেলোয়াড়ের খেলা পেয়ে আমার তো তাতে লাভই হচ্ছে।’

তারপর মশাই এলো সেই ভয়ঙ্কর রাত, আমার বুক-ভাঙানো রাত।

ট্রাপিজের ডাণ্ডায় মাথা রেখে পা ছুটি ওপরে তুলে ট্রাপিজ ছলিয়ে দিলে কেঁটো। সে এক আশ্চর্য কায়দা। বলে বোঝাতে পারবো না আপনাকে। চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা শক্ত। তারপর অদ্ভুত এক ডিগবাজি খেয়ে ট্রাপিজের ডাণ্ডার ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো কেঁটোখন। আমি অবাক হয়ে নিচে দাঁড়িয়ে দেখছি। কেঁটোখন আমার দিকে তাকিয়ে বিস্ত্রী রকম হাসলে একবার, ফার্গানী ভঙ্গীতে। বুঝলুম ওতো কেঁটোর হাসি নয়। কেঁটোর মুখ দিয়ে ফার্গানের হাসি। শয়তানের হাসি, পিলে-চমকানো হাসি।

হঠাৎ এক নিমিষে যেন দমকা হাওয়ায় সেই হাসির দীপ দপ করে নিভে গেল। ভয়ে চীৎকার করে উঠলো কেঁটোখন। অত উঁচু ট্রাপিজে দাঁড়িয়ে একা কেঁটোখন, রাম ভীতু কেঁটোখন। তাকে উঁচু গাছের ডগায় তুলে রেখে মই নিয়ে চট করে সরে পড়েছে ফার্গান।

হতভম্ব হয়ে গেছি আমি। কেমন করে বাঁচাবো কেঁটোকে! কিন্তু বোধকরি সেকেণ্ড দুয়েকের বেশী ভাবতে সময় পাইনি। হাত পা শূণ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ট্রাপিজ থেকে সোঁজা নিচে পড়ে গেল কেঁটোখন—তার গলা থেকে বেরিয়ে এলো একটা আর্তনাদ।

পাগলের মতো ছুটে গেলুম। বোধকরি আধ মিনিটের ভেতর আমাকে নির্বংশ করে চলে গেল কেঁটোখন। মনে হলো কানের পেছনে ফিসফিস করে কে যেন কি বললে, আর মনে হলো গলার আওয়াজটা ফার্গানের।

* * * *

প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোর মুখে গল্প শুনে চলে গেলাম ডাক্তার ত্রিপাঠীর কাছে।

“গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাসে ছুটি গাধা ছিল।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। “একটি পালিয়েছে।”

“আরেকটি?”

“আছে। তার নাম ভজ্জহরি তলাপাত্র, ওরফে প্রফেসর ট্যালপেট্রো।”

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম “সে কি ? বাঙালীর গৌরব প্রফেসর ট্যালপেট্রো, এত বড় একটা সার্কাস গড়ে তুলেছেন—”

“তলাপাত্র তাই বুঝে রেখেছে বটে, রেবেকাও আশা তামাশায় আশা অনুকম্পায় ওকে তাই বুঝিয়েছে বা বুঝতে দিয়েছে।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। “শোনো তাহলে বলি। ভজ্জহরি তলাপাত্র ছিল এক সার্কাস কোম্পানীতে নামমাত্র মাইনের চাকুরে। সেই সার্কাসের সেরা আকর্ষণ ছিল রেবেকা। ওর যেমন রূপ, তেমন যৌবন, তেমনি ফিগার, আর সার্কাসী খেলায় তেমনি অদ্ভুত ওস্তাদি। ভজ্জহরির ছুরবস্থা দেখে রেবেকা ওকে ক্লাউনের পদে প্রমোশন দিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ালে— সার্কাসের মালিক রেবেকার কথায় ওঠে বসে। কিন্তু ক্লাউনগিরি করা তো আর সোজা নয়। আসর জমাতে পারলে না ভজ্জহরি, আর না পেরে চটে গেল মালিকের ওপর। করলে ঝগড়া। মালিক ভজ্জহরিকে অপমান করে বার করে দিলে। মেয়েদের মন বোঝা ভার। ঐ ভজ্জহরির ব্যাপার নিয়েই ঝগড়া করে ঐ সার্কাস কোম্পানী ছেড়ে দিলে রেবেকা। মালিক হাতে পায়ে ধরে কত সাধাসাধনা করলে, রেবেকা কিছুতেই মন বদলালে না। রেবেকা-হারা সার্কাস দল বেশী দিন টিকলে না, ভেঙে গেল। মন ভেঙে গেল সার্কাস মালিকের। মরে গেল কিছু দিন পর। কেউ কেউ বললে আত্মহত্যা করেছে। তারপর রেবেকাকে কেন্দ্র করে কতক ঐ ভাঙা সার্কাসের, কতক অণু সার্কাসের, আর কতক নতুন খেলোয়াড় নিয়ে একটা নতুন সার্কাস দল গড়ে উঠল, অর্থাৎ রেবেকাই গড়ে তুললে। চুস্কের মতো যেমন আকর্ষণ করতে জানে মেয়েটা, যেমন বিজলীর চমক ওর চোখে আর বিজলী তরঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে, তেমনি অদ্ভুত ওর সংগঠনী প্রতিভা। ওর ভেতর এক সঙ্গে চুস্ক, বিজ্যৎ, আগুন, ঝর্ণা, শ্রোত—যাকগে, ওসব ফর্দ দিয়ে

আর কি হবে? নতুন সার্কাস দল গড়ে তুললে রেবেকা, কিন্তু তলাপাত্র-র বেনামে। কেন? না, বেচারি ভজ্জহরিকে একটা কেউকেটা বানিয়ে তুলতে হবে। তলাপাত্র নাম বদলে রেবেকা বানাতে ট্যাল্পেট্রো, আর তার আগে বসালে প্রফেসর। ভজ্জহরি তলাপাত্র হলো প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো।”

“এ সবই রেবেকার কাণ্ড?”

“নেপথ্যে থেকে। প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো সেল্ফ-মেড ম্যান নয় ধনপতি, রেবেকা-মেড ম্যান।”

“আশ্চর্য !!!”

“আশ্চর্য কিছুই নয় ধনপতি। আমাদের অনেক সেল্ফ-মেড ম্যানেরই নেপথ্য ইতিহাস এই রকম। তারপর আরো শোনো। নানা কায়দায় বিজ্ঞাপনী ঢাক পিটিয়ে প্রচার হতে লাগল প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো, তথা দি গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস বাংলার গৌরব।”

বললাম “কিন্তু দি গ্রেট ডংকি অ্যাক্ট, সেই অভিনব গাথার খেলাটা?”

ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন “ওর পেছনেও মগজটি রেবেকার, তলাপাত্র-র শুধু গাথার খাটুনিটুকু। টেইক্‌ ইট ফ্রম মি ধনপতি, রেবেকা এক আশ্চর্য মেয়ে। ওর কথা বেশী ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আর ওর কথাই বেশী ভেবেছে ভজ্জহরি।”

হায় প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো!

বললাম “ট্যাল্পেট্রোর কিন্তু বুক-ভরতি অগুনতি মেডেল।”

“সবগুলোই সার্কাস কোম্পানীর খরচে ফরমায়েশ দিয়ে তৈরি আর ফরমায়েশী লোক দিয়ে দেওয়ানো। এর পেছনেও মগজ রেবেকার। তলাপাত্র হয় তো আজও জানে না স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কেউ তাকে মেডেল দেয়নি। ওর মেডেল প্রাপ্তি সব সাজানো ব্যাপার। আর নিজের বিজ্ঞাপনী জয়টাকের আওয়াজ শুনতে শুনতে নিজেকে হয় তো

সত্যিই সে বাংলার গৌরব বলে ভাবে ।”

হায় প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো !!

বললাম “প্রফেসর ট্যাল্পেট্রোর এখন অহোরাত্র ভাবনা রেবেকা ভেগে না যায় আর গ্রেট রয়েল বেঙ্গল সার্কাস ভেঙে না যায় ।”

“ও, তুমি বুঝি জানো না ? রেবেকা ভেগে গেছে, সার্কাস দলও ভেঙে গেছে । ঐ যাওয়া সহিতে পারেনি তলাপাত্র । সহিতে পারেনি বলেই ওকে এই স্থানাটোরিআমে দেখতে পাচ্ছ । ঐ ছুটি অপ্রিয় সত্যকেই ও প্রাণপণে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে । ফিরে গেলেই ওকে সেই সত্যের সম্মুখীন হতে হবে । তাই ওর সারা অন্তরাত্মা মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে রয়েছে এই স্থানাটোরিআমকে । এ জায়গা ছেড়ে যেতে হলে ওর বুক ফেটে যাবে ।”

“কিন্তু—”

“জানি, খনপতি । নিজের মনকে তলাপাত্র অবিরাম এই ধোঁকা দিয়ে চলেছে যে সে চলে যেতে চায়, স্থানাটোরিআম তাকে ছেড়ে দিতে চাইছে না ।”

হায় প্রফেসর ট্যাল্পেট্রো, রেবেকা-মুখ ট্যাল্পেট্রো !!!

শকুন্তলা স্তানাটোরিআমের পুরোনো অতিথি শাস্ত্রু দস্তিদার তাঁ
ঘরের দরজায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন :

শ্রীশাস্ত্রু দস্তিদার,

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক ।

প্রবেশ করলাম ঔপন্যাসিক দস্তিদারের ঘরে । তিনি তাঁর লেখার
টেবিলে বসে লিখছিলেন । টেবিলের ওপর প্রচুর কাগজ । ভদ্র-
লোকের ডান হাতে ঝর্ণা-কলম, বাঁ হাতে জ্বলন্ত ধূমায়মান বর্মা চুরুট ।

বললেন “আমুন খনপতিবাবু ।”

বসলাম ওপাশে গিয়ে অনাবৃত তক্তাপোশের ওপর । বিছানাহীন
তক্তাপোশ । লক্ষ্য করে দেখলাম বিছানা চলে গেছে তক্তাপোশের
তলায় ।

শুধালেম “বিছানার এ অবস্থা কেন ? বিছানা ভালো লাগছে না
নাকি, শাস্ত্রুবাবু ?”

শাস্ত্রুবাবু বললেন “শুধুন তা’হলে আমার উপস্থাসের নতুন
অধ্যায়টা ।” বলে পড়তে লাগলেন :

“সসীমকুমার সেই পোড়োবাড়ির বৈঠকখানা ঘরে একটি অতি
পুরাতন নড়বড়ে তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া শুইয়া কড়িকাঠ
গুণগতেছিল । তক্তাপোশে অন্তনতি ছারপোকা । গায়ে লঙ্কথের
পাঞ্জাবি । পাঞ্জাবির লঙ্কথ ভেদ করিয়া তাহার সসীমকুমারের রক্ত
পান করিতেছিল । সেদিকে সসীমের বিন্দুমাত্র আক্কেপ নাই । সে
তখন ভাবিতেছিল—”

“কি ভাবিতেছিল ?”

“তাই তো ভেবে মরছি ।” বললেন তিনি । “বলুন তো কি
ভাবানো যায় সসীমকুমারকে ?”

বললাম “আপনার উপস্থাসের নায়ক কি ভাবে তা আমার বাতলে
দেওয়া কি ঠিক হবে শাস্ত্রুবাবু ?”

শান্তনুবাবু বললেন “তা ছাড়া, আপনাকে তো সসীমের সঙ্গে পরিচয় করিয়েই দেওয়া হয়নি এতক্ষণ পর্যন্ত । সসীম একজন কথা-সাহিত্যিক, লেখে গল্প, লেখে উপন্যাস । বাজারে তার শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, নিকৃষ্ট গল্প—আরো নানা রকমের গল্পসংগ্রহ বেরিয়ে ছ ছ করে কাটছে । তার উপন্যাস বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কে কার আগে পড়বে । তার বাড়ির বৈঠকখানায় ঘন ঘন হানা দেয় পাবলিশারের দল, টাকার তোড়া হাতে নিয়ে ।”

“কেন ?”

“তার কলমের আরো আরো বই ছাপতে চায় তারা । শেষকালে ক্ষেপে গেল সসীমকুমার । বললে, পুড়িয়ে ফেলব অ্যাঙ্গিনের লেখা সব বই । সবগুলি রাবিশ লিখেছি । ওরা আমার ত্যাজ্যপুত্র । এবার লিখব সত্যিকারের ভালো একখানা উপন্যাস ।”

“তারপর ?”

“এক ঝাঁকে ছদ্মবেশে আর নকল নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে । হ্যাঁ ভালো কথা, সসীমকুমার নামটাই কিন্তু নকল নাম, আর গৌফ কামানটাই তার ছদ্মবেশ । আগে সে বরাবরই গৌফ রাখত । বরাবর মানে গৌফ ওঠার পর থেকে । তাই তার গৌফ-কামানো চেহারা অনেককেই ধান্দা দিলে । শূন্য পকেটে বেরিয়ে পড়ল ভবঘুরে সসীম-কুমার । তারপর পোড়োবাড়ির তক্তাপোশে শুয়ে শুয়ে”—

আমি বললাম “কোথাকার পোড়োবাড়ির তক্তাপোশে ?”

একটু দমে গেলেন শান্তনু দস্তিদার । তারপর বললেন “সেটা এখনো ভেবে দেখিনি ।”

“পোড়োবাড়িতে এনে ফেললেন । বেচারী খাবে কি ? ঘুমোবে কোথায় ? তক্তাপোশের ওপরে পাতবার বিছানা আছে কিনা তাও বলেননি ।” আমি বললাম মহা চিস্তিতভাবে । “তাছাড়া মশারি ? আপনার ঐ পোড়োবাড়িতে মশা আছে নিশ্চয়ই ?”

শান্তনুবাবু বললেন, “ওখানে মশা রাখা-না-রাখা তো আমার খুশি। তাই তো ভাবছি মশার কামড় খাইয়ে সসীমকুমারকে ম্যালেরিয়ার ভোগাবো কিনা।”

আমি বললাম “সর্বনাশ! ঐ পোড়োবাড়িতে ম্যালেরিয়ার পড়লে ওকে সেবা-শুশ্রূষা করবে কে? ডাক্তারই বা ডাকবে কে? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এত জায়গা আর এত বাড়ি থাকতে সসীমকুমার পোড়োবাড়িতে গিয়ে পড়ল কেন? হলোই বা ছদ্মনাম, হলোই বা গৌরব কামানো।”

শান্তনু দস্তিদার বললেন, “সসীম বেরিয়েছে তার নতুন উপস্থাসের প্লট সংগ্রহ করতে। এবারে সে বাইরের জীবন থেকে প্লট নেবে, মাকড়সার মত শুধু মগজ থেকে নয়।”

বললাম “পোড়োবাড়ি ছাড়া কি প্লট হয় না? বসতবাড়িতে কোনো প্লট নেই?”

শান্তনু দস্তিদার বললেন “বসতবাড়িতে তো আমরা হরদম বাস করছি, কিন্তু পোড়োবাড়ি হরদম চোখে আর দেখি কোথায়? তাই তো পোড়োবাড়িতে এনে ফেললাম সসীমকুমারকে। এই পোড়োবাড়ির নিরালায় একা বসে বসে নতুন উপস্থাসের প্লট পাকিয়ে তুলবে সে।”

“ওকে কি আর কোথাও ঘোরাবেন না?”

“ঘোরাবো বই কি? কিন্তু ওর সব ঘোরার কেন্দ্র হবে ঐ পোড়ো-বাড়ি।” বলে শান্তনু দস্তিদার আমার কানে কানে বললেন “কি আশ্চর্য রূপক, কি অদ্ভুত সিম্বলিজম, লক্ষ্য করেছেন ধনপতিবাবু? কেন্দ্র হবে ঐ পোড়োবাড়ি। সু-স্ট্রাকচার ইজিটটা লক্ষ্য করবেন।”

শান্তনু দস্তিদার বললেন “এই সসীমকুমারের কলম দিয়ে আমি যা খুশি লেখাতে পারি। সসীম আমার এই হাতের মুঠোর ভেতর। সাহিত্য-সৃষ্টি-তত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথা বলছি, লক্ষ্য করেছেন ধনপতিবাবু?”

“একটা পুরোনো অখ্যার শুন্ন খনপতিবাবু।” বলে শান্তনু দস্তিদার তাঁর উপস্থানের প্রথম দিক থেকে শোনাতে লাগলেন :

“বিখ্যাত শিল্পপতি বনোয়ারীলাল হালদার রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করিতেছিলেন। পাশে কেহ নাই। পাশের ঘরে কস্তা ভানুমতী পিয়ানো বাজাইয়া ইরাজী গান গাহিতেছে, পাশে বসিয়া শুনিতেছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট তপন রস্ম, ভানুমতীর ভাবী জীবনসঙ্গী। তপন তস্ময় হইয়া একটি হাতানা সিগার ফুঁকিতেছে। পাশের ঘরে তাহার ভাবী শ্বশুর রোগযাতনায় প্রলাপ বকিতেছে, তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই।”

বললাম “সে কি?”

শান্তনু বললেন “বুড়ো রিটারার করে ছেলেমেয়েদের নামে সব কিছু উইল করে দিয়ে ফেলেছে—মানে ওকে দিয়ে আমিই উইল করিয়েছি— এখন বুড়ো গেলেই আপদ যায়। তাই আর ওঁর দিকে কেউ—বুলেন না?”

বললাম “তাহলে আর বেচারাকে আটকে রেখে কষ্ট দিচ্ছেন কেন? চটপট মেরে ফেলুন না। লোকটা মরে রেহাই পাক।”

“মেরে ফেললেই তো ভোগ শেষ হয়ে গেল লোকটার। ওকে তিলে তিলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ভোগাবো আমি, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।” বললেন শান্তনু দস্তিদার : “কলমের বাগে যখন পেয়েছি, সহজে রেহাই দেবো না হারামজাদা হালদারকে।”

তারপর আমার কানে কানে বললেন “বনোয়ারী হালদারের আসলটি হচ্ছে বনমালী চাকলাদার। বড় ভুগিয়েছিল আমাকে। তাই এভাবে উপস্থানের পাতায় ওর ওপর আক্রোশ মেটাচ্ছি।”

ডাক্তার ত্রিপাঠীর ঘরে ঢুকে দেখি তিনি একা চুপচাপ বসে আছেন।

বললাম “কি ভাবছেন ?”

ডাক্তার ত্রিপাঠী ভাঁজকরা খবরের কাগজটা আমার সামনে ধরে আঙুল দিয়ে একটা খবর দেখালেন। দেখলাম, এক বৃদ্ধ ভক্তলোকের ফটো ছাপা হয়েছে, তার তলার খবরে প্রকাশ শ্রীরামপুরের প্রবীণ উকীল মহেশ্বর চৌধুরী সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। বোধ হলো এই বৃদ্ধের মৃত্যুসংবাদ পড়েই বিষণ্ণবোধ করছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।

শুধালেম “ইনি আপনার আত্মীয় ? বন্ধু ?”

“কেউ নন।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। বলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মনে প্রশ্ন এলো ডাক্তার ত্রিপাঠীর মন বিষণ্ণ হয়েছে কেন ? ঐ অপরিচিত বৃদ্ধ শ্রীরামপুরী উকীলের মৃত্যু-সংবাদ পড়ে কি তাঁর মনে হয়েছে “দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো”, লালাবাবুর যেমন “বেলা যার” শুনে বৈরাগ্য এসেছিল ?

“তোমার কাছে বলতে বাধা নেই, আমি একবার প্রেমে পড়েছিলাম।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। “শুনতে চাও তো বলো, শোনাই।”

“শোনান।”

“তখন আমি বছর পাঁচ ছয় হলো ডাক্তারী পাশ করে বেরিয়ে প্র্যাক্টিস্ করছি।” বলতে শুরু করলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী, “একরকম ভালোই পশার হচ্ছে, হাতযশও খুব। একদিন এক রোগী দেখতে গেলাম। রোগীর বয়স মাঝারির চাইতে কিছু বেশী। আর তাঁর একমাত্র কন্যার বয়সটা তখনকার দিনের হিসেবে কিছু বেশীই—উনিশ। বাপকে যখন দেখতে যেতাম, মেয়ে বাপের কাছে থাকত। আর কি সেবাই করত বাপের। তিন রাত ব্যামোর বড্ড বাড়াবাড়ি ছিল, পাছে রাতে কোনো রকম বিপদ হয় সেই ভয়েই বাড়ির গিন্নীর মিনতিতে

আমায় ঐ তিন রাতই ও-বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল। তারপর ক্রমইসলি কেটে গেলে আর রাতে থাকতে হত না, কিন্তু রোজ যাওয়া আসাটা চালু রইল।”

বললাম “তারপর আপনি ঐ উনিশ বছরের মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেলেন?”

“ঠিক তাই। মনে হতে লাগল সেও আমার প্রেমে আকৃষ্ট হবে গেছে, কিন্তু বুক ফাটলেও তার মুখ ফুটেছে না। আমিও যতবার তার কাছে হৃদয়দুয়ার খুলতে গেলাম ততবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। ভীষণ হৃদয়ের প্রেম কোনদিনই নিবেদন করা হলো না। তারপর—”

“তারপর?”

“বিয়ে হয়ে গেল তিলোত্তমার। উনিশ বছরের তিলোত্তমা পরকী হয়ে চলে গেল। মনে হলো আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল, এই মরু সাহারার বৃকে কখনো আর মরুত্বান জাগবে না। তুমি কখনো প্রেমে-দ্রেমে পড়েছ ধনপতি?”

“আজ্ঞে না।”

“তা’হলে বুঝতে পারবে না তিলোত্তমাকে চিরতরে হারিয়ে আমার বৃকে কি হাহাকার জেগেছিল। সে-হাহাকার তিলোত্তমার বাবার কাছেও শেষ পর্যন্ত গোপন রইল না।”

“কি করে?”

“আগুন বেশীদিন ছাইচাপা থাকে না, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।”

“আজ্ঞে, তা’ যা বলেছেন। শাক দিয়ে বেশীদিন মাছ ঢেকে রাখা যায় না।”

“তিলোত্তমা যে আমার গোটা হৃদয়টাকেই দখল করে বসে আছে সে খবরটা তিনি হঠাৎ একদিন টের পেয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বন্ধপঙ্কর ভেদ করে যে আত্মনাক বেরিয়ে এলো, তা শুনে তুমি

অশ্রু সংবরণ করতে পারতে না খনপতি।”

“কি আর্তনাদ?”

“তিনি আর্তনাদ করে বললেন, তিলোত্তমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করবারই একান্ত বাসনা তাঁর ছিল, তিলোত্তমারও সেই ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু আমার তরফ থেকে সাড়া না-পেয়ে ওঁরা কেউ আমার সামনে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করতে ভরসা পাননি। আমি একবার মুখ ফুটে বললেই যাকে চির-জীবনের জগ্গে পেতাম, মুখ ফোঁটাইনি বলে সে চিরদিনের জগ্গে আমার পর হয়ে গেল। তার কিছুদিন বাদেই বদলি হয়ে অস্ত্র চলে গেলেন তিলোত্তমার বাবা। তারপর আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।”

“তিলোত্তমা দেবীকে তারপর কি আপনি ভুলতে পারেন নি, ডাক্তার ত্রিপাঠী?”

“মনে হতে লাগল তাকে কোনোদিন ভুলতে পারব না। অথচ বিবেক বলতে লাগল হাজার হোক, সে যখন পরজ্ঞী হয়ে গেছে তখন আর তাকে মনে রাখা উচিত নয়, যেমন করে হোক তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াটাই আমার কর্তব্য। তাই তিলোত্তমাকে ভুলে যাবার জগ্গে আমি বিয়ে করে ফেললাম পদ্মলোচনের ভাবী মাকে। আমার ছেলে পদ্মলোচনকে তো তুমি দেখেছো?”

“তার ফটো দেখেছি।”

“তার ভাবী মাকে বিয়ে করে ফেললাম। প্রথম প্রথম বিবেক একটু কামড়াতে লাগল। মনে হতে লাগল তিলোত্তমার প্রতি অবিচার করেছি মৃণালিনীকে বিয়ে করে, আর মৃণালিনীর প্রতি অজ্ঞায় করেছি যে-হৃদয়ে তিলোত্তমাকে ভোলা অসম্ভব, সে-হৃদয়ে মৃণালিনীকেও ডেকে এনে।”

“তারপর?”

“তারপর—কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করবে খনপতি?”

“করব।”

“যা’ বলব তা’ আর কাউকে বলবে না ?”

“বলব না ।”

“তাহলে শোনো । ছ’টার বছরেই একেবারে ভুলে গেলাম আমার প্রথম প্রেম আর তিলোত্তমার কথা । অনেক রোগীর ভিড়ে ভুলে গেলাম তিলোত্তমার বাবাও একদিন আমার রোগী ছিলেন ।”

“শুনে বড় বিস্ময় লাগছে, ডাক্তার ত্রিপাঠী । শুনেছিলাম প্রথম প্রেম ভোলা যায় না । অথবা যা ভোলা যায় তা প্রথম প্রেম নয় ।”

“ছ’নিয়ার অনেক সত্য কথাই সোজা করে বললে এমনি বিস্ময় জাগায় ধনপতি । পাছে ভুল ভেঙে যায় এই ভয়ে সত্যকে তাই অনেকে প্রাণপণে এড়িয়ে থাকে । কিন্তু ঐ যে বললে যা ভোলা যায় তা প্রথম প্রেম নয়, ওতে তোমার একটা বড় রকমের সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে । তুমি ভাবছো, আমি তিলোত্তমার প্রেমে পড়িনি । ভুল, ভুল, সে তোমার ভুল, ধনপতি । তার প্রেমে পড়েছিলাম, আকর্ষ ডুবেছিলাম তার প্রেমে, এও যেমন সত্য, তারপর তাকে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, এও ঠিক তেমনি সত্য । এতে এতটুকু সন্দেহ কোরো না । মাসের পর মাস গেছে, বছরের পর বছর, একবারও মনে হয়নি তিলোত্তমার কথা । এতদিন পর আজ মনে পড়ল আজকের এই কাগজে শ্রীরামপুরের উকীল মহেশ্বর চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ দেখে ।”

শিহরিত কণ্ঠে শুখালাম “কে এই মহেশ্বর চৌধুরী, যিনি আপনার আত্মীয় নন, বন্ধু নন, কেউ নন, অথচ যার মৃত্যু-সংবাদ দেখে আপনার মনে পড়ে গেল বছ বছর ভুলে থাকা প্রথম প্রেমের কথা ? তিলোত্তমা দেবী কি এঁরই—”

“সহধর্মিনী ।” বললেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী ।

“শোকে সহানুভূতি জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে দেবো কি তিলোত্তমা চৌধুরীকে—যাকে বলে কন্ডোলেন্স লেটার ?” শুখালেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী ।

আমি বললাম “ঠিকানা জানবেন কি করে ?”

ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন “কেয়ার অব লেট্ মহেশ্বর চৌধুরী, প্লাডার, শ্রীরামপুর লিখলেই চলবে। যাঁর মৃত্যু-সংবাদ খবরের কাগজে খবরের পাতায় অমন ভাবে ছাপা হয় তাঁর বাড়ি ডাকঘরের লোকেরা নিশ্চয়ই চিনবে।”

“অসম্ভব নয়। কিন্তু এতগুলো বছর পরে আপনার নাম কি মনে আছে তিলোত্তমা দেবীর ? তিনি যদি ভুলে গিয়ে থাকেন ? তা হলে সেই বহু বছর আগেকার কাহিনীটাও চিঠির গোড়ার দিকে লিখে দিতে হয়।”

তিলোত্তমা যে তাঁকে ভুলে গিয়ে থাকতেও পারেন, এ কথা শুনে ডাক্তার ত্রিপাঠী একটু ব্যথিত হলেন বলে মনে হলো।

“আমার খুব সন্দেহ হয় তিলোত্তমা আমার ওপর অভিমান করেছিল, ধনপতি।” বললেন তিনি। “ওর পাণিগ্রহণ করবার অভিলাষ ওর বাবাকে জানাবার গভীর সুযোগ পেয়েও যে জানাইনি, এতে ওর মত অতুলনীয়ার অপমান আর অভিমানবোধ কিছু অস্বাভাবিক নয়। সেই অপরাধে তিলোত্তমার কাছে আমি চিরদিন অপরাধী হয়ে রইলাম আমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেনি তিলোত্তমা।”

“আপনি অকারণ মন খারাপ করছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।”

“অকারণ নয় ধনপতি। কারণটা যে কত গভীর তা তুমি অনুভব করতে পারছ না বলেই এ কথা বলছ। এ কথাটা তাকে জানানো দরকার যে সে আমাকে ভুল বুঝেছিল। মহেশ্বর চৌধুরীর ঘরগী হয়ে সে যখন চিরদিনের জন্তে আমার পর হয়ে গেল, তখন আমার হৃদয় যে নিদারুণ আঘাতে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেইটে কি তাকে একবার জানিয়ে দেওয়া উচিত নয় ?”

“সেটা সেই সময় বা তার কাছাকাছি জানিয়ে দিলে যে কাজ হত, অ্যান্ডিন বাদে তা, হবার নয় ডাক্তার ত্রিপাঠী।” বললাম আমি।

“ইংরেজিতে বলে স্ট্রাইক হু আয়রণ হোয়াইল ইট ইজ হট। লোহা গরম থাকতে থাকতে তার মাথায় ঘা মারতে হয়। অ্যাঙ্কিনে লোহা যে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তা ছাড়া—”

“তা ছাড়া আবার কি ধনপতি?”

“আপনার হৃদয় চুরমারের খবরটা উনি বিশ্বাস করবেন না। যদিও বা করেন, ভাববেন ওটা সাময়িক চুরমার মাত্র, পরে বেমালুম জোড়া লেগে গেছে। কারণ তারপর আপনি বিয়ে করে রীতিমতো ঘর সংসার করেছেন, বাপ ঠাকুর্দা হয়েছে, স্ততরাং এখন—”

“ভুলের পর ভুল করে গেলাম এ জীবনে। এখন আর শোধরাবার সময় কি নেই ধনপতি?” অসীম ব্যাকুলতা ডাক্তার ত্রিপাঠীর কণ্ঠে।

মনে হলো বুঝেছি তাঁর ব্যাকুলতার উৎস। তাঁর মন কাঁদছে তাঁর আপন বেদনায়, কাঁদছে তিলোত্তমার হৃৎখে; বিপত্নীক ত্রিলোচন, পতিহারা তিলোত্তমা; বিরহের হাহাকার হু হু করে কাঁদছে দুজনেরি অন্তরে। অথচ ইতিহাস আজ অগ্ররকম হতে পারত, বিরহের বেদনা আজ কাঁদতো না এ ছয়ের হৃদয়ে—শুধু ডাক্তার ত্রিলোচনের একটু ভুলের জগ্রেই সব তচনচ হয়ে গেল!

“কিন্তু একটা কথা তুমি ভেবে দেখনি ধনপতি।”

“কি কথা ডাক্তার?”

চিঠি যদি লিখি তাকে, ত্রো কি বলে সম্বোধন করব? তুমি বলে, না আপনি বলে?” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। “তখন যাকে তুমি বলতাম, সেই তাকেই এখন আপনি বলতেও কেমন কেমন লাগবে, অথচ তুমি বলাটাও তেমন সহজ নয়। এই দোটানা এড়াবো কি করে?”

“ইংরেজিতে চিঠি লিখে। ও ভাষায় আপনি-তুমির বালাই নেই।”

“কিন্তু সেটাও ভালো দেখাবে না ধনপতি। তাই ভাবছি দরকার নেই চিঠি লিখে।”

“আর এ নিয়ে অনর্থক মাথাও ঘামাবেন না, ডাক্তার। জীবনে

কি হতে পারত কিন্তু হলো না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো শেষ নেই।” বললাম আমি। “আমি একটা ঘটনা জানি শুধু। সে ঘটনা আপনার কাহিনীর চাইতেও করুণ। ছেলেটির বাবা মেয়ের বাবার কাছে নগদ পণ দাবী করলেন পাঁচশো টাকা। তার একটি আধলা কমে তিনি রাজী নন। অথচ মেয়ের বাবা পরম গরীব, নামমাত্র পণ দেবারও ক্ষমতা নেই তাঁর, পাঁচশো টাকা তো দূরের কথা। এদিকে ছেলেটি ঐ গরীব বাপের মেয়েটিকে দেখেছে আড়াল থেকে, আর দেখে মুগ্ধও হয়েছে। ওকে না পেলে জীবনটাই বার্থ হয়ে যাবে, এমনি ভাব। অথচ ওর বাপ নাছোড়বান্দা, পাঁচশো টাকা পণের এক আধলা কমে রাজী নন। তখন ছেলেটি এক কাণ্ড করলে।”

“কি কাণ্ড? আত্মহত্যা করে বসল নাকি?”

“না। অনেক দিনে আর অনেক কষ্টে বেচারী সেভিস ব্যাঙ্কে শ’চারেক টাকা জমিয়েছিল। সব টাকা তুলে ফেললে ব্যাঙ্ক থেকে! আর কিছু টাকা বন্ধুদের কাছে ধার নিয়ে পাঁচশো টাকা পুরো করে চলে গেল গোপনে ঐ মেয়েটির বাবার কাছে। গিয়ে বললে এই নিন পাঁচশো টাকা। এই টাকা পণ দেবেন আমার বাবাকে, কিন্তু সাবধান, এ টাকা আমার কাছ থেকে পেয়েছেন একথা যেন ঘুণাক্ষরেও না প্রকাশ পায়।”

“তারপর? প্রকাশ পেয়ে গেল?”

“বলছি শুধু। মেয়েটির বাবা কম্পিত হস্তে টাকাগুলো নিলেন ছেলেটির কাছ থেকে। বললেন ‘খুবই অস্বাভাবিক হচ্ছে, এ টাকা তোমার কাছ থেকে নিচ্ছি বাবা। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই নিচ্ছি। এ টাকা যত শীগ্গির পারি তোমায় আমি শোধ দিয়ে দেবো।’ ছেলেটি বললে ‘ছি, ছি, সে কি কথা?’ এর কয়েকদিন পর মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল।”

“ঐ ছেলেটির সঙ্গে।”

“না। আরেকটি ছেলের সঙ্গে।”

“বলো কি ধনপতি? এ যে রীতিমতো চাঁচাড়ামির ব্যাপার হে।

ঐ ছেলোট—যে পাঁচশো টাকা দিয়েছিল মেয়েটির বাবাকে—কোনোরকম হাঙ্গামা করলে না ?’

“পারলে না করতে । ঐ পাঁচশো টাকার লজ্জাতেই পারলে না । একেবারে চুপ করে গেল বেচারী । তারপর ঐ মেয়েটি যখন স্বামীর ঘরে চলে গেল, তখন একদিন গোপনে গিয়ে মেয়েটির বাবাকে শুধালে ‘একি করলেন আপনি ?’”

“তখন মেয়েটির বাবা কি বললে ?”

“তিনি বললেন, যে ছেলোটের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে তাদের হুজনে ভালোবাসা ছিল । ছেলোটের বাপকে পণ দিতে হয়নি, কারণ ছেলোটের বাপ বেঁচে নেই । পাঁচশো টাকা থেকে বিয়ের খরচায় কিছু গেছে, বাকীটা মেয়ে জামাইকে দিতে হয়েছে নতুন সংসার পেতে বসতে । মেয়েটার মুখ চেয়ে এ বিয়ে দিতে হলো বাবা । আশীর্বাদ করো মেয়ে আমার সুখী হোক । তোমার টাকা আমি শোধ করে দেবো বাবা, কিন্তু তোমার দয়ার কথা এ জীবনে ভুলব না ।” বললেন মেয়েটির বাবা । ছেলোট বললে ‘টাকা আমাকে ফেরত দিতে হবে না । আপনার মেয়ে সুখী হোক ।’ এই বলে চলে এলো ছেলোট ।”

“তারপর ”

“ছেলোট মনের হুগ্ধে বিয়ে করলে না । প্রার্থনা করলে মেয়েটি সুখী হোক । প্রথম দর্শনেই বোধকরি সে ভালবেসে ফেলেছিল মেয়েটিকে । কিন্তু বিধাতা যেখানে মারেন সেখানে মানুষ কি করতে পারে ? সুখী হলো না মেয়েটি । অপদার্থ জ্ঞানোয়ার স্বামীর হাতে পড়ে হুগ্ধের সীমা রইল না তার । তারপর এখন সে এক রুগ্ন সন্তান নিয়ে পড়ে আছে বাপের বাড়িতে । স্বামী বেঁচে আছে বটে, আর হয় তো থাকবেও অনেক দিন, কিন্তু স্ত্রীর কোনো খোঁজখবর নেওয়া সে দরকার মনে করে না । তাহলে এখন ভেবে দেখুন সেই ছেলোটের কথা, যার অনেক কষ্টের পাঁচশো টাকাও গেল, তার ওপর জীবনটাও

বরবাদ হয়ে গেল। অথচ মেয়েটাও সুখী হলো না।”

ডাক্তার ত্রিপাঠী একটু ভেবে বললেন “তুমি ঠিকই বলেছ ধনপতি।
বিধাতা মাঝে মাঝে বড় যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসেন। সেন্টিমেন্টের
বালাই একদম নেই বিধাতার।”

ডাক্তার ত্রিপাঠীর প্রেমের কাহিনী আমার মুখেই প্রথম শুনলেন
শান্তনু দস্তিদার। শুনে বললেন “আমিও প্রেমে পড়েছিলাম। সে
কাহিনী শুনলে আপনি অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না ধনপতিবাবু।”

বললাম “শোনান তা’হলে।”

শোনালেন শান্তনু দস্তিদার। বললেন “অনেক বছর আগেকার
কথা। তখন আমার বয়স এখনকার চাইতে অনেক কম। ইন্জিনিয়ারিং
না ডাক্তারী তা ঠিক মনে পড়ছে না, ফাইন্সাল পাশ করে বেরিয়েছি,
সামনে সারা ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে ধূ ধূ ময়দানের মতো। এমন সময়
চিঠি এলো চন্দনপুর থেকে, লিখেছে বন্ধু সঞ্জীব। ছুটি নামই আপনাকে
পালটে বলছি, আসল নাম অ্যাডিন বাদে আমার মনেও নেই। লিখেছে
‘এসো ক’টা দিন থেকে যাও আমাদের সঙ্গে।’ গঙ্গার ধারে ওদের
চমৎকার বাড়ি, বাড়ির লাগোয়া ওদের পুরুষানুক্রমিক কারখানা।
তা’ছাড়া হাঁস, মুরগী, দুগ্ধবতী গাভী, পাঁঠা ইত্যাদির অভাব নেই
বাড়িতে। জেলেপাড়াও কাছাকাছি, জেলেরা খাতিরও করে, তাই
মাছের মহোৎসব রোজই লেগে আছে। আমি বরাবরই খাইয়ে-মানুষ,
তাছাড়া তখন রীতিমতো জিম্জাল্টিক, কুস্তি, ডন-বৈঠক, যুযুৎসু করা
তাগ্‌ড়া শরীর। সাদরে নিমন্ত্রণ মাথায় তুলে নিয়ে চলে গেলাম
চন্দনপুর। ছোট্ট অথচ ছিমছাম স্টেশন। ট্রেন থামবার আগেই মুখ
বাড়িয়ে দেখি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধু সঞ্জীব। বললে ‘এসেছিস’?
বললাম ‘এসেছি’। তারপর গাড়িতে চড়ে রওনা হলাম; যদুর মনে

পড়ে সঞ্জীবেরই গাড়িখানা। অবিশি ভাড়াগাড়িও হতে পারে।
 অ্যাঁদিন বাদে মাথার ভেতর সব গুলিয়ে গেছে। বাড়িতে পৌঁছলাম
 সঞ্জীবদের!...আপনি খুব ফেনানো ফাঁপানো গল্প পছন্দ করেন, না
 সংক্ষিপ্ত?”

“আসল কথা কিছু বাদ না দিয়ে যতটা সংক্ষেপ করতে পারেন।”

“কোনটা আসল কোনটা নকল সেইটে বোঝা তো সোজা নয়
 ধনপতিবাবু! তবু আপনি যখন বলছেন, চেষ্টার ক্রটি করব না।
 ও-বাড়িতে অগ্ন্যস্ত্র চরিত্রদের তাহলে বাদ দিই, বলি শুধু মানসীর কথা।
 মানসী নামটা আপনার পছন্দ তো?”

“মন্দ কি?”

“তাহলে মনে করুন মানসীকেই সঞ্জীবের বোন করা যাক। এক-
 মাত্র বোন। চোখ-ধাঁধানো রূপসী নয়, চোখ-জুড়ানো সুন্দরী। অথচ
 রাঁধতে জানে চমৎকার। ওর তখনকার চেহারা মনে নেই, কিন্তু ওর
 রান্না করা পাঁঠা, মাছ, মুরগী, হাঁসের স্বাদ আজো যেন জিভে লেগে
 রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, মানসী যেমন রাঁধিয়ে তেমনি খাইয়ে
 আধুনিক চিন্তাজাত রং-চঙে মেয়েদের মতো পেটরোগা নয়। যেমন
 খাওয়াতে ওস্তাদ, তেমনি খেতে ওস্তাদ। ধীরে ধীরে এমনি স্থূললিত
 ভঙ্গিমায় তার খাওয়া, যে দেখবে সেই মুগ্ধ হয়ে ভাববে খাওয়া মানে
 শুধু চিবানো আর গেলা নয়, খাওয়াও একটা মহৎ শিল্প-কর্ম, যাকে বলে
 আর্ট। আপনার জীবনে এ একটা মহা-হৃর্ভাগ্য ধনপতিবাবু যে আপনি
 মানসীর খাওয়া দেখেননি!”

আমার নিদারুণ হৃর্ভাগ্যের কথা ভেবে করুণ হয়ে উঠল শান্তনু
 দস্তিদারের ছঁচোখ।

“ঐ খাওয়া দেখে মুগ্ধ হলাম আমি।” একটু সামলে নিয়ে আবার
 বলতে লাগলেন তিনি। “খাওয়ার অমন অনির্বচনীয় ভঙ্গী জীবনে
 আর কখনো দেখিনি। কোথাও যেন ছন্দপতন নেই, কোনো স্তর

বেস্তুর লাগছে না।”

“উনি আপনাদের সঙ্গে বসেই খেতেন কুখি?”

“প্রথমে নয়। খাওয়ার ব্যাপারে আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যেতে চেয়েছিল মানসী। কিন্তু যখন শুনলাম রান্না ওরই হাতের, তখন আমি বললাম ওকেও আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে। আমার জেদের সঙ্গে জেদ মেলালে সম্ভব। মানসীকে খেতে বসতে হল আমাদেরই সঙ্গে।”

“এক সঙ্গে খেতে বসে বসেই প্রেমের সূত্রপাত হলো?”

“সে যে কোন মুহূর্তে কেমন করে হলো তা বলতে পারিনে ধনপতিবাবু। হয়তো তখন তা টেরও পাইনি। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়াতুম মানসীর সঙ্গে, গোধূলির রঙে রঙিন দেখতুম মানসীকে। সম্ভবের ছিল গান লিখে তাতে সুর বসিয়ে মানসীকে শেখাবার বাতিক। তাই যে সময় মেয়েরা গান গাইলে সাধারণত গাইত রবি ঠাকুর বা রজনী সেনের গান, সে সময় মানসী গাইত সম্ভবের গান।”

“কেমন ছিল সে গান?”

“জানি নে ধনপতিবাবু। বলতে পারব না আপনাকে। কারণ মানসী যখন গান গাইত তখন খেয়াল করিনি কি সে গানের বাণী, কি তার সুর—সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠত মানসীর অপরূপ গাওয়া। এ যেন মানসীর রান্নার মতো। মানসীর রান্না যখন খেতাম, তখন মুক রসনায় খেয়ালই হত না কি খাচ্ছি—মাছ, হাঁস, পাঁঠা, না মুরগী। আপনার হুঁচকানো ধনপতিবাবু, আপনি মানসীর রান্না খাননি।”

“কিন্তু রান্নার কথা থাক, গানের কথা বলুন।”

“ঐ যে বলেছি, বলতে পারব না আপনাকে। বলা সম্ভব নয়। হয় তো তার প্রয়োজনও নেই। শুধু আরেকটা কথা বলা আবশ্যিক,—মানসী মাতৃক পাশ করে বাড়িতে আঁই-এ পড়ছিল। চন্দনপুরের কাকাবাঁহি মেয়েদের কলেজ ছিল না তখন।”

“তারপর ?”

“একদিনকার কথা বলি। সেদিন নদীতে সাঁতার কাটলাম আমরা তিনজন—আমি, সঞ্জীব আর মানসী। ফিরে এসে আমার সর্দি হলো, সর্দি থেকে জ্বর। বিছানা নিতে হলো।”

“অর্থাৎ শয্যাশায়ী হলেন ?”

“হলাম। কলকাতার সুইমিং ক্লাবে শেখা সাঁতারুর শরীরে নদীর জলে সাঁতারের বাড়াবাড়ি সহ্য না। ব্যামোর বাড়াবাড়ি হলো। কতদিন আধা বেছাঁশ অবস্থায় কাটল খেয়াল নেই। আশ্চর্য শুক্রাঘা করেছিল মানসী—নইলে আপনার সঙ্গে দেখা হত কিনা বলা যায় না। বেছাঁশ অবস্থার ঘোরে অনেক প্রলাপ বকেছি, জানিনে কি সব কথা বলেছি প্রলাপে। প্রলাপের দমকা হাওয়ায় কি খুলে গিয়েছিল আমার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার ? প্রলাপের ঘোরে আমি কি বলেছিলাম জীবনে মানসীকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে ? তাই শুনে কি দোলা লেগেছিল মানসীর মুক্ত হৃদয়ে ? এসব প্রশ্নের নিঃসংশয় জবাব আপনাকে দিতে পারব না ধনপতিবাবু। শুধু এইটুকু বলতে পারি, যখন সেরে উঠে অল্পপথ্য করলাম তখন যেন নতুন আলো দেখতে পেলাম মানসীর চোখে। সঞ্জীবকে বললাম ‘ভাই এইবারে ফিরে যাই।’ সঞ্জীব বললে ‘শরীরটা আরো একটু সুস্থ হোক তারপরে যেও’; মানসীরও এই ইচ্ছা। সুতরাং থাকতে লাগলুম; আমারও ফিরবার তাড়া ছিল না। এমনি সময় আবির্ভাব হলো বরুণ চৌধুরীর।”

“বরুণ চৌধুরী কে ?”

বরুণ চৌধুরী সঞ্জীবের আরেকটি বন্ধু, তখন মাত্র বিলেত থেকে ফিরেছেন। শাস্ত্রু দস্তিদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। তিনি একদিন হঠাৎ এসে অতিথি হলেন সঞ্জীবের বাড়ি।

“কাহিনী অকারণে লম্বা করব না ধনপতিবাবু।” বললেন শাস্ত্রু দস্তিদার। “সংক্ষেপে বলি, বরুণ চৌধুরী এসে পড়াতে সমস্ত স্বপ্ন যেন

তখনই হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, এক জললে দুই সিংহের এক সঙ্গে থাকা পোষাবে না। জেলাসি বলুন, দুঃখ বলুন, অভিমান বলুন; যা খুশি বলুন একে। বরুণ বড়লোক, বিলাতফেরত, ব্যাচেলার। পাত্র হিসেবে ওর বাজারদর আমার চাইতে চড়া। আর থাকা উচিত বোধ হলো না। বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সেদিন হাজির ছিল না বরুণ চৌধুরী, একদিনের জন্তে কি একটা জরুরি কাজে গিয়েছিল গঙ্গার ওপারে। ওর সেই অস্থপস্থিতির ফাঁকে সেইদিনই কেটে পড়লাম। বিদায়-বেলায় মানসী বললে ‘আবার আসবেন কথা দিয়ে যান।’ আমি বললাম ‘আসব বই কি যথাসময়ে।’ মনে মনে বললাম ‘যদি নিমন্ত্রণ পাই!’ স্টেশনে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল সঞ্জীব।”

“তারপর আবার কবে গেলেন মানসীর কাছে?”

“মানসীর সঙ্গে দেখা হল ষোলো বছর বাদে। তখন তার বয়স পঁইত্রিশ কি ছত্রিশ বছর হবে, ওজনও অনেক।”

“এত বছর বাদে কেন?”

“বিলেতে চলে গিয়েছিলাম দুঃখে, অভিমানে, রাগে। যে-ভারতে মানসীকে পেলাম না সে-ভারত আর ভালো লাগল না। বিলেতে, মানে লণ্ডন শহরে চাকরি জুটিয়ে নিয়ে তুলে থাকতে চাইলাম ভারতকে আর ভারতবাসিনী মানসীকে। ষোলো বছর একটানা বিলেতে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু...কিন্তু...”

“কিন্তু কি শান্তমুখাবু?”

“ভুলতে পারলুম না মানসীকে। ষোলো বছরের চেষ্টা ব্যর্থ হলো।”

“লণ্ডনে কোনো লণ্ডনবাসিনীর প্রেম পাননি, কিংবা প্রেমে পড়েননি?”

“সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। মনের গভীরে শেকড় গেড়ে বসেছিল মানসী। তাই ষোলো বছর পর ভারতে ফিরে এলাম, যে-বিলেতী কোম্পানীতে চাকরি করতাম তারি কলকাতা অফিসে। এদিককার কোনো খোঁজখবর ইচ্ছা করেই রাখিনি। হঠাৎ এক রবিবার

রওনা হয়ে গোলাম চন্দনপুর। সঞ্জীবের বাড়ি। গিয়ে দেখি অনেক বদলে গেছে বাড়ির চেহারা—তবু নির্ভুলভাবে চেনা যাচ্ছে সেই সনাতন সিংহদ্বার দেখে। সিংহদ্বারের বাইরে সাদা পাথরে কালো হরকে লেখা নন্দন-কানন। বাড়িটির ঐ বাড়ি-অল্পচিত নামটি দিয়ে গিয়েছিলেন সঞ্জীবের বাবা। সঞ্জীব তাতে আপত্তি করেনি। দীর্ঘ বোলো বছর পর নন্দন কাননে প্রবেশ করে ডাকলাম সঞ্জীবকে। ভাবলাম, এতদিন পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে উল্লসিত হয়ে উঠবে সঞ্জীব। কিন্তু সঞ্জীবের সাড়া পেলাম না।”

সঞ্জীব ছিল না বাড়িতে। বেরিয়ে এলেন একটি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সের মহিলা। তিনি শাস্ত্রু দস্তিদারকে দেখে প্রথমটা থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন “আমুন।”

ঘরের ভেতরে ঢুকে প্রদত্ত আসনে বসে শাস্ত্রু বললেন “সঞ্জীব কোথায়?”

মহিলা বললেন “দাদা স্বর্গে চলে গেছেন আজ আট বছর হলো।”

দাদা ??? চমকে উঠলেন শাস্ত্রু দস্তিদার। “তবে কি তুমি মানসী?”

“আমি মানসী। আপনি কি আমায় চিনতে পারেননি?”

“তুমি অনেক বদলে গেছ মানসী।”

“আপনি কিন্তু ঠিক তেমনি আছেন।” বলে রহস্য মাখানো হাসি হাসল মানসী। “তবু ভালো এখন চিনতে পেরেছেন।”

বৈধব্যের বেশ পরিহিতা নয় মানসী। সাধব্যের চিহ্নও নেই কপালে বা সিঁথিতে।

“আট বছর হলো সঞ্জীব চলে গেছে? তুমি তা’হলে—”

“একা। কারখানা বিক্রী করে সে টাকা নিরালোভ্য হাসপাতাল ফাণ্ডে দিয়ে দিয়েছি। আমি এখানকার মেয়ে স্কুলে শিক্ষকিত্রীর কাজ করছি।”

কাহিনী এই পর্যন্ত শুনিয়ে খেমে গেলেন শান্তনু দত্তিদার। ছুটি চোখ রুমাল দিয়ে মুছে নিলেন একবার। বৃকলাম, এ কাহিনী কলবার সময় তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারেন না।

বললাম “তারপর ?”

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে শান্তনু দত্তিদার শুধালেন মানসীকে “করুণ চৌধুরী কোথায় ?”

মানসী বললে “জামাইবাবু এখন আছেন দক্ষিণ ভারতে।”

“জামাইবাবু ?...??...”

“হ্যাঁ। আমার মাসতুতো দিদির স্বামী। বরুণবাবুকে আপনি দেখেছেন, আমার সেই দিদিকে দেখেননি।”

সেদিন মানসীর আতিথ্য গ্রহণ করলেন শান্তনু দত্তিদার। বাড়িতে স্নানের গরম জলের ব্যকস্থা করে দিল মানসী। যোলো বছর আগে নদীতে স্নানের কল কি হয়েছিল মানসী তা এখনো ভুলে যায়নি।

নিজের হাতে সেই দীর্ঘ যোলো বছর আগেকার মত স্নান করে থাকতামো মানসী। সেই আশ্চর্য, অতুলনীয়, অনির্বচনীয় স্নান। কিন্তু কিছুতে খেল না একসঙ্গে বসে। বহু সাধ্যসম্মত করেও তাকে স্নান করানো গেল না।

ছপুরের ঝাণ্ডার পর বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা করে দিয়ে মানসী বলল “বিকলে চম্ ঝাণ্ডার পর পাঁচটার গাড়িতে কেবল রওনা হচ্ছে পারবেন।” বলে ভেতরে চলে গেল মানসী।

বিকলে চা খেতে খেতে শান্তনু দত্তিদার কললেন, “আমার একটা কথা শুনবে মানসী ?”

“বলুন।”

“যোলো বছর আগে ভুল বুকে চলে গিয়েছিলুম। আজ যদি সে ভুল ভাঙল, সে ভুল কি আর ঝোঁকানো যায় না ?”

মানসীর চোখ দুটি যেন একবার দপ করে জ্বলে উঠল। মানসী

বলল “যেদিন আপনি চলে গিয়েছিলেন সেদিন মন আমার কেঁদে আকুল হয়েছিল। আশা করেছিলাম আপনি আবার আসবেন, আমাকে দাবি করবেন প্রেমের দাবিতে। খবর না দিয়ে বিলেত চলে গেলেন, কিন্তু খবর তবু পেলাম। দাদা হয়তো চিঠি লিখতেন আপনাকে; আমিই লিখতে দিইনি। আপনার চোখে যে-আলো দেখেছিলাম তাকে ভুল বুঝে আমি আপনার ওপর নির্ভর করে রইলাম। অনেক প্রেম প্রত্যাখ্যান করলাম অনায়াসে, শুধু এই অন্ধ আশায় যে আপনি আসবেন আমায় গ্রহণ করতে। কিন্তু এলেন না আপনি। বছরের পর বছর চলে গেল মরুভূমির ওপর দিয়ে। শেষ হয়ে গেল জীবনের বসন্ত ঋতু।...”

মানসীকে থামিয়ে দিলেন শান্তনু দস্তিদার, আর সহিতে না পেরে।

বললেন “আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমিও করেছি এই দীর্ঘ বোলো বছর ধরে। তোমার আমার দুজনের শৃঙ্খল জীবন এসো আমরা পূর্ণ করি মানসী।”

অর্থাৎ সোজা ভাষায় এতদিন পরে মানসীকে জীবনসঙ্গিনী রূপে প্রার্থনা করলেন শান্তনু দস্তিদার।

“কিন্তু মানসী রাজী হ'ল না।” বললেন শান্তনু দস্তিদার।—
“মানসীর আপন হাতে তৈরি চায়ের সঙ্গে ফুলকো লুচি আর ফুলকপির তরকারী খেয়ে বিদায় নিতে হ'ল। তার বছর কয়েকের ভেতর পরলোকে রওনা হয়ে গেল মানসী।”

বলে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন শান্তনু দস্তিদার। আমি সাব্বনা দিয়ে বললাম “ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না শান্তনুবাবু। যিনি যখন যাবার তিনি তখন চলেই যান, এ কেউ রোধ করতে পারে না।”

বলে পাছে ওঁর কাহিনী শুনে অশ্রু সংবরণ করতে পারলে উনি মনে ছুঃখ পান, সেই ভয়ে আমিও পরম উচ্ছ্বাসের ভান করে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে শুরু করলাম।

পরে শোনালাম এ-কাহিনী ডাক্তার ত্রিপাঠীকে । ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন “বোগাস, বোগাস, একেবারে বোগাস । এ শুধু খান্না দিয়ে বাহাছুরি নেবার কমপ্লেক্স !”

*

*

*

শকুন্তলা স্থানাটোরিআমের নৈঋত কোণে ইউক্যালিপ্টাস গাছের তলায় একটি তাঁবুতে থাকেন ভোম্বল গাঙ্গুলী—ইনি গুলন্দাজ গোকুল গাঙ্গুলীর ভূতপূর্ব মেজদা নামে পরিচিত, কারণ গোকুল গাঙ্গুলী বছর তিনেক হলো ভূত হয়েছেন । তাঁবুর বাইরে বড় বড় ছই হরফে একটি সংখ্যা লেখা আছে : ১৩ ।

ভোম্বল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ডাক্তার ত্রিপাঠীর সঙ্গে । “দেখুন তো এ কিনা ।” আমাকে দেখিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী ।

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভোম্বল গাঙ্গুলী হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন “না, ইনি নন ।”

গুখালাম “আমি কে নই ?”

“তেরো নম্বর পাঁঠা ।” বললেন ভোম্বল গাঙ্গুলী ।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম “তার মানে ?”

“একে আপনার কাহিনীটি বলুন ভোম্বলবাবু ।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী ।

“শুনুন তাহলে বলি ।” বলে কাহিনী শুরু করলেন গুলন্দাজ গোকুল গাঙ্গুলীর মেজদা ভোম্বল গাঙ্গুলী ।.....

নন্দনপুর ইন্সটিশান থেকে বাঁকা রাস্তা চলে গেছে পুর্ব মুখো, তারই পাশে ‘জনার্দনের সরাইখানা’ । সাইনবোর্ডের দরকার হয় না, ঐ নাম সবাই জানে । ইন্সটিশান থেকে মিনিটখানেকের পথ, খুব কাছেও নয়, খুব দূরেও নয় । ইচ্ছে করে আর বেশ ভেবে চিন্তেই সরাইখানার

জন্তে এই জায়গা বেছে নিয়েছিলো জনার্দন বাড়ে। এখান থেকে ইন্টিশান পরিষ্কার দেখা যায়; দেখা যায় রেলগাড়ির ঝাঁক-ঝাঁক, আর শোনা যায় আওয়াজ, অথচ ইঞ্জিনের ধোঁয়ার ঝোঁক লাগে না গায়ে নাকে চোখে, লাইনের ওপর সারি সারি চাকার কিক্ কিক্ কানে ভালোই লাগে এই দূর থেকে। এখানে বসে খানাপিনা করতে করতে গাড়ি এসে পড়লেও সহজেই ছুটে গিয়ে ধরা যায়—ইন্টিশানে—আগে টিকিট করা থাকলে আরো সহজে।

সরাইখানার মাথার ওপরে ছড়ানো বহু পুরোনো বটগাছ। হয়তো এরই আশ্রয়ের লোভে এই জায়গায়টায় সরাইখানার প্রতিষ্ঠা করেছিলো জনার্দন, ওরফে জনাই। সন্ধ্যার পর থেকে আবহাওয়াটা একটু একটু করে গভীর হতে থাকে। হবেই। মাথার ওপর আশ্রয়িতা পাতার ছাতা দিয়ে আকাশকে আড়াল করে রেখেছে বিরাট বটগাছ, তার তলায় সন্ধ্যায় রাতে অন্ধকারের পোয়া বারো। বিশেষ করে জনাই জোরালো আলো জোগায় না সরাইখানায়। আলোর বাজে খরচ তার পছন্দ নয়; বলে, ‘অন্ধকার দূর করাটাই দরকার, চোখ ধাঁধাবার দরকারটা কি?’

জনাইর সরাইখানায় ‘জিতরে মা-জননীদেব বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে’; কিন্তু মা-জননীদেব এ সুযোগ নিতে দেখা যায় না, সরাইখানায় বাবা জনকদেবই একচেটিয়া আড্ডা। আর আড্ডা প্যাঁচা ও বাহুড়ের রটগাছের শব্দ পাতার জঙ্গলে। প্যাঁচার দিনের বেলা তুল মেরে থাকে, আর সারা রাত যখন তখন গভীর হাঁক ছাড়ে, শুধু কোনো কোনো খন্ডের পিঁলে চমকায়। সে চমকানি টের পেলে ভয়-ভাঙ্গানো হানি হেসে জনার্দন (ওরফে জনাই) বলে ‘ও কিছু নয়, লক্ষী প্যাঁচ। আমার সরাইখানার লক্ষী। এ ভাক-বে কখনো শুকবে তারি মকল হবে।’

জনাইয়ের সরাইখানার যেমন বাহুড়াক, তেমনি খন্ডেরের ভিড়।

তার কারণও আছে। এখানকার পরোটা, কাটলেট, চপ খেতে খাসা, খাওয়াতেও খাসা। মাছ, মাংস, ডিম, নিরামিষ—সব রকম খানাই জনাইয়ের সরাইখানায় একবার খেলে আবার খেতে ইচ্ছে করে। দাম একটু বেশীই নেয় জনাই, তবু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না কোনো খদ্দের, কেন না কাছাকাছি আর কোনো সরাইখানা নেই, আর জনাইয়ের মুখের প্রত্যেকটি কথা যেন মধুতে ডোবানো, রসে ভরপুর। রসের কথা শোনার জগ্রে আলাদা পয়সা নেয় না জনাই, ওটা ফাট।

সরাইখানার দোচালার বাইরে খোলা জায়গায় বটগাছের তলায় খান কয়েক লম্বা বেঞ্চি দাঁড়িয়ে আছে, তারাই খদ্দের মহোদয়গণের বসবার আসন।

যে রাতের কথা বলছি সে রাতের তারিখটা ছিলো জনার্দনের সরাইখানার ইতিহাসে একটা বিশেষ তারিখ।

সরাইখানার সামনে একটা বড় চৌকো পিজ্জবোর্ডের ওপর সাদা কাগজ সঁাটা, তার ওপর মোটা মোটা বড় বড় হরফে লেখা—

সুবর্ণ সংবাদ! সুবর্ণ সংবাদ! সুবর্ণ সংবাদ!

জনার্দন সরাইখানার ১৩নং জন্ম-বাৎসরীক।

অদ্দ এই উপলক্ষে প্রোত্যেক আট আনার (কম পক্ষে) খড়িহার মহোদয়গণকে এক বাটা কচি পঁাঠার ঘুগনী বীণামূল্যে দেওয়া হইবে। জাহারা পঁাটা খান না, তাহার উহার বদলে গাছ-পঁাটার ডালনা পাইবেন।

ইহা ভিগ্ন প্রোত্যেক মা-জননী খড়িহারকে ছগাছি কাচের চুড়ি উপহার দেওয়া হইবে।

শান্তি শান্তি শান্তি।

আমি আড়ালে জনার্দনকে বলেছিলুম ‘এ ছুমি কি করেছে জনার্দন?’

এ রাজসূয় যজ্ঞ সামলাবে কি করে ?

বিনীত কণ্ঠে হাত বুলিয়ে জনার্দন বলেছিল 'আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে প্রভু, জনার্দন সামলাতে না পারে কি ? এ তো একটা তুচ্ছ ব্যাপার ।'

বাইরের সবগুলো বেষ্টিতেই খদ্দেরের ভিড়, কোনরকমে জায়গা করে একটা বেঞ্চের কিনারায় দেহ রেখে বসলুম। বসে বললুম 'হাফ কাপ চা দেখি হে জনার্দন ।' এ আমার বরাবরের নিয়ম। আধ পেয়ালা চা দেখতে চাই, জনার্দন পুরো এক পেয়ালা চা খাওয়ায়। দাম সাধাসাধি করি, নেয় না জনার্দন। পয়সাটা ফেরত দিই পকেটে। তরল ছাড়া বাইরে কোথাও কিছু খাইনে, এও জানে জনার্দন।

চা খাচ্ছি আর খদ্দের মহোদয়গণের থানাপিনা দেখছি। রাত তখন সাড়ে ন'টা, ওদিকে মহাকালীর মন্দিরে ঢাকের দু'একটা পাতলা আওয়াজ পাওয়া গেল। আওয়াজ ঠিক নয়, আওয়াজের মহড়া। বারুইপুরের মহাকালীর মন্দির ডাকসাইটে; আর কি অদ্ভুত যোগাযোগ, আজ জনার্দনের সরাইখানার জন্মবার্ষিকীর রাতেই এই মন্দিরেরও প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী! রাত দশটার লগ্নে মহাকালীর বিশেষ পূজা, তখন কড়া করে বাজবে একগাদা ঢাক। এই পূজা উপলক্ষ্যে লোকের ভিড় হয় বারুইপুরে; মা কালীর অনেক ভক্ত রেলে চড়ে আসে নানা জায়গা থেকে।

আট আনার খদ্দেরদের এক বাটি করে পাঁঠার ঘুগনি বা গাছ-পাঁঠার ডালনা দেওয়ালো জনার্দন। গাছের তলায় বসে যে নাপিতরা দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে দেয়, তাদের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের ছোট্ট বাটি থাকে, তেমনি ছোট বাটি। কিন্তু বাটি, তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই! কোনো মা-জননীর টিকিটিও দেখা গেল না; কাঁচের চুড়িগুলোর কি ব্যবস্থা হলো জানি নে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়লো ইস্তিশানে, ট্রেন এলো কিছুক্ষণ বাদে । তারো কিছুক্ষণ বাদে কিছু কিছু লোক দেখা গেল ইস্তিশান থেকে এইদিকেই আসছে । জনার্দন বললে এদের বেশীর ভাগ আসছে মহাকালীর মন্দিরে পূজা দেখতে । এ নাকি সত্যিই দেখবার মতো পূজা—অবশ্য তাদেরই কাছে, যারা বলি-টলি পছন্দ করেন ।

একটি খন্দের মহোদয় বললেন ‘তার মানে ?’

জনার্দন বললে ‘মা মহাকালীর সামনে আজ তেরোটা পাঁঠা বলি হবে । সে এক দেখবার জিনিস ।’

‘তেরোটা ?...??...???...????...’ কে যেন প্রায় আত্ননাদ করে উঠলো ‘তেরোটা ? ঠিক তেরোটা ?’ চেয়ে দেখি বটগাছের গুড়ির কাছে একটা ছোট টুলের ওপর আধা অন্ধকারে বসে আছেন এক নতুন চেহারার ভদ্রলোক । তিনিই যেন পরম বিশ্বাসের চরম ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ গরম হয়ে উঠছেন ।

জনার্দন বললে ‘হ্যাঁ, একটি একটি করে তেরোটা পাঁঠা আজ বলি হবে । ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ মুণ্ড নেমে যাবে খড় থেকে খাঁড়ার ঘায়ে । বলি দেবে করালীকিশোর, গেল পূজোয় নিখিল চব্বিশ পরগণা পাঁঠা বলির পাল্লায় যে পয়লা হয়ে কাপ পেয়েছিলো ।’

শুনে সেই নতুন চেহারার লোকটির যেন কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল । কি পরিবর্তন সেটা বর্ণনা করে বোঝানো অসম্ভব ।

একজন শুধালে ‘কিন্তু তেরোটা পাঁঠা কেন ? তার কম বা বেশী কেন নয় ?’

জনার্দন হেসে বললে ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম । কে যেন এক নাম-না-জানা ভদ্রলোক লোক দিয়ে এই তেরোটা পাঁঠা পাঠিয়েছেন মহাকালীর মন্দিরে আজই রাতে বলি দেবার জন্তে । ‘তার নাকি বিশেষ একটা মানত আছে । মন্দিরের মহাস্ত পঁাঠাগুলি গ্রহণ

করেছেন। এরই মধ্যে তবলার সোকানদাররাও ছুটে এসেছে বলি হয়ে গেলে ছাল নিয়ে যাবে বলে। পাঁঠার চামড়া কিয়টাই তবলা ছাওয়া হয়।’

একজন খন্ডের কচি পাঁঠার দুগনি একটু একটু করে চাখতে চাখতে শুধালেন ‘কে এই ভক্তলোকটি, যিনি বলির জন্তে পাঁঠা পাঠিয়েছেন?’

জনাদর্শন বললে ‘তাঁর নাম ধাম তিনি জানাতে চাননি, জানাও যায়নি। পাঁঠাগুলি যে নিয়ে এসেছিলো সে লোক পাঁঠা তেরোটা ডেলিভারি দিয়েই কেটে পড়েছে। সেই পাঁঠাদেরই আজ রাত দশটার কাটা হবে। সেই মানসওরাল ভক্তলোকও হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে বলি দেখতে আসবেন। আপন মানডের বলি আপন চোখে দেখবেন না এ আমি ভাবতে পারিনি।’

একজন ইংরিজী পুছুয়া খন্ডের বললেন ‘থারটিন ইজ এ টেরিবলি আন্লাকি নাহার।’ তারপর আমাদের ওপর চোখের চাউনি বুলিয়ে বাংলা তর্জমা করে বললেন ‘ভেরো হচ্ছে একটি ভয়ানক অপরাধ সংখ্যা। একেবারে বাইবেলের স্ক্রু থেকে। যীশুর তেরো নম্বর সঙ্গী জুডাস যীশুকে ধরিয়ে দিয়ে ক্রুশে চাউয়েছিলো।’

আরেকজন বললে ‘খুনে আসামিয়ারে যে দড়ি দিয়ে কাঁসিতে ঝোলানো হয় তাতে তেরোটা গেরো দেওয়া থাকে। মা কালী বলে কুলে পড়বার পাচাতনে উঠতে হয় তেরোটা সিঁড়ি পেরিয়ে। আসামীর পায়ের তলা থেকে তক্তা সরে যায় গলায় দড়ি পরে দাঁড়াবার ভেরো স্নেহও পরে। তাছাড়া’

সেই নতুন চেহারার ভক্তলোকটি বললেন অদ্ভুত কণ্ঠে ‘অদ্ভুত! অদ্ভুত! অদ্ভুত! সেই ভেরো বছরে দেখা তেরো স্বপ্নের কাহিনীর সঙ্গে এ যে কতখানি মিলে যাচ্ছে!’ সঙ্গে সঙ্গে ওপরে একটা প্যাঁচার ভাক !!!

তেরো বছরে দেখা তেরো স্বপ্ন! জড়াক করে আমাদের মন

লাফিয়ে উঠলো কোঁড়ালের বিজলী চাবুক খেয়ে। সবাই মিলে এক বাক্যে বলে উঠলেন ‘বলুন আপনার স্বপ্ন-কাহিনী। আশ্রম, এগিয়ে আশ্রম এদিকে।’

‘না—না—না, এগোতে বলবেন না আমাকে। এইখানেই ভাল আছি।’ এমনভাবে বলে উঠলেন সেই ভদ্রলোক, যেন তাকে এদিকে নিয়ে আসতে গেলেই তিনি ছুটে পালিয়ে যাবেন। মুখচোরা; একলা থাকার পিয়ালী, ভীষণ স্বভাবের হয়তো ভদ্রলোক, তাই যতটা পারেন আড়ালে থাকতে চান। যেমন আমার অবস্থা আর কি! মঞ্চে উঠে দাঁড়াতে হলেই তার আগে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজি।

বললুম ‘থাক থাক। আপনাকে আসতে হবে না। আপনি ঐখান থেকেই বলুন। আমরা নীরব হয়ে শুনি।’

সেই ভদ্রলোক বললেন ‘বলতে আমি পারি, কিন্তু হয় তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন স্রেফ বানিয়ে বলছি। অবশ্য এমন অদ্ভুত মিল যে বিশ্বাস করাও শক্ত। অদ্ভুত! অদ্ভুত! অদ্ভুত!’

নতুন ভদ্রলোকের মুখের ওপর যে আধ-আলো পড়েছিলো তাইতো লক্ষ্য করলুম ও চেহারা একেবারে এমন বিশেষত্বহীন যে মনে রাখা শক্ত। একশো লোকের ভিড়ে মিশে গেলেও এঁকে আর খুঁজে বার করা যাবে বলে মনে হয় না।

সেই ইংরিজী জানা ভদ্রলোক বললেন ‘দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ হোরাশিও। মানে আমাদের বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, এমন অনেক কিছু হুনিয়ায় আক্কাহর ঘটছে।’

সবাই মিলে বললুম ‘ঘটছেই তো। আর ঘটবেই। আটকাবে কে? বলুন আপনার কাহিনী। বিশ্বাস না করি তো এসে কান মলে দিয়ে যাবেন।’

‘শুধুন ভালো।’ শুরু করলেন সেই বিশেষত্বহীন চেহারার ভদ্রলোক। ‘এক ভদ্রলোক তাঁর এক জন্মদিনের রাতে স্বপ্ন দেখলেন

এক মা কালীর মন্দিরে তেরোটি পঁঠা বলির ব্যবস্থা হচ্ছে ।’

শুনে জনার্দন বললে ‘মা কালীর মন্দির ? তেরো পঁঠা ? এ যে আমাদের এই—’

চটে মটে সেই ভদ্রলোক বললেন ‘এই জন্তেই তো বলেছিলুম আপনাদের বিশ্বাস হবে না । থাক তাহলে কাহিনী ।’

জনার্দনকে ধমকে থামিয়ে ভদ্রলোককে আবার রাজী করালুম । ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন ‘স্বপ্নে ভদ্রলোক দেখলেন তেরোটি পঁঠার গলায় ঝুলানো চাক্তিতে যার যার নিজের নম্বর লেখা । ভদ্রলোক নিজেও ঐ তেরো পঁঠার এক পঁঠা । গলায় ঝুলছে তাঁর তেরো নম্বরের চাক্তি !’

আমি বললুম ‘অর্থাৎ স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক নিজেই তেরো নম্বর পঁঠা ?’

ঠিক ধরেছেন । ভদ্রলোক নিজেই তেরো নম্বর পঁঠা । ঢাকের বাজি বেজে উঠলো টিমি টিমি টিমি টিমি, তারপর রাম-খাঁড়ার এক ঘায়ে ঘ্যাচাং করে নেমে গেল এক নম্বর পঁঠার ধড় । সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল ঐ তেরো নম্বর পঁঠা ভদ্রলোকের ঘুম । জেগে দেখেন ভয়ের গরমে সারা গা তাঁর ঘামে ভিজ়ে গেছে । কয়েকদিন পর সে স্বপ্ন তিনি ভুলে গেলেন ! এর পরের বছর জন্মদিনের রাতে আবার দেখলেন সেই স্বপ্ন, তফাৎ শুধু এবারে এক নম্বর পঁঠা আর নেই । আছে বাকী বারোটি পঁঠা—হু’ নম্বর থেকে তেরো নম্বর । আর সেই তেরো নম্বর পঁঠা তিনি নিজেই । এমনি করে ফি বছর তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন জন্মতিথির রাতে, আর ফি বছর একটি একটি করে পঁঠা ঘ্যাচাং করে কমে যেতে লাগলো* ক্রমে ক্রমে তাঁর নিজের ঘ্যাচাং হবার পালা যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই আতঙ্কে তাঁর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম, কিন্তু গোড়া থেকেই ঐ স্বপ্ন কাহিনী তিনি নিজের মনেই গোপন রেখেছিলেন, কেউ বিশ্বাস

করতে চাইবে না বলে । বারো বছরে বারোটি পঁঠা ঘ্যাচ্যাং হয়ে গেল । বাকী রইলেন তেরো নম্বর পঁঠা সেই ভদ্রলোক । একটা গোটা বছর আতঙ্কে আতঙ্কে কাটালেন তিনি—আগামী বারের স্বপ্নে তাঁর পালা ! এলো সেই আগামী বারের জন্মতিথির রাত । উদ্বেগে উদ্বেগে এর আগের তিন চার রাত জেগে কেটেছে তাঁর, সারারাত বিছানায় জেগে জেগে ছটফটানি এড়াতে পারে নি বাবা মা'র চোখ । তাঁরা শুধালেন কি হয়েছে । তিনি বললেন ও কিছু নয়, এমনি । বাপ ছিলেন ভালো ডাক্তার । জন্মতিথি উৎসব সাঙ্গ হতে রাত দশটা বাজলো । তেরো নম্বর পঁঠা ভেবেছিলেন আজকের জন্মতিথির রাতটা প্রাণপণে জেগে থেকে স্বপ্নের ঘ্যাচ্যাং এড়িয়ে কাঁড়া কাটাবেন, আর তাহলেই নিশ্চিন্দি । করতেনও তাই, আর পারতেনও করতে । কিন্তু বিধাতা পুরুষের বিধান ওল্টায় কার বাবার সাধ্য ? ভদ্রলোকের ডাক্তার বাবা ভাবলেন ক'টা রাত না ঘুমিয়ে কষ্ট পেয়েছে, আজকের শুভ জন্মতিথির রাতটা যেন আরামে ঘুমোতে পারে । তাই সর্ববতের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন এমন মোক্ষম ঘুমপাড়ানী দাওয়াই, যে তেরো নম্বর পঁঠা ভদ্রলোকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে জোর ঘুম এলো হু'চোখ জুড়ে । ঘুমিয়ে দেখলেন সেই বিষম স্বপ্ন । মা কালীর মন্দির, বাজছে কাঁসর ঘণ্টা, বাজছে ঢাকের বাজি টি-ডিডি টি-ডিডি টিডিডিডি । গলা আটকে দিলে হাঁড়িকাঠে । বাজনার আওয়াজ তো নয় যেন অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা এক সঙ্গে বাজছে । তারপর বলীবর্দ চেহারার বলি-দেনে-ওয়ালার হাতের খাঁড়া জয় মা কালী বলে ঝপাং করে নেমে এলো, আর—'

আমরা শ্রোতার দল উৎকণ্ঠ উৎকর্ণ তটস্থ হয়ে দুর্দান্ত কৌতূহলের শ্রোতে ভাসছি ।* উদ্বেজনায় ফেটে চোঁচির হবার অবস্থা । ।

বললুম 'আর……? ! ! ! ! ?'

'ঘ্যাচ্যাং করে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়লো তেরো নম্বর পঁঠার ছিন্নশির ।'

লম্বা দৌড়ের পাল্লা শেষ করে যেন দম নিতে লাগলেন ভদ্রলোক ।

আমরা শুধালুম ‘পরদিন ভোরবেলা ?’

ভক্তলোক একটু ধেমেরে বিজ্ঞাপন নিয়ে বললেন ‘পরদিন ভোরে রোদ উঠে গেল, তবু তেরো-নম্বর পাঁঠা ভক্তলোক গুঠেন না। দরজা খাকানো হলো, তবু সাড়া নেই। দরজা ভেঙে প্রবেশ করে দেখা গেল ডাক্তারবাবুর ছেলের দেহে প্রাণ নেই, বিছানায় রক্ত, আর দুরের পোঁচ দিয়ে গলার এপাশ থেকে ওপাশ কাটা ; দুরের রক্তমাখা কলা পড়ে আছে। ডাক্তার বাবা আর ডাক্তারগিন্নীমা কেঁদে ভাসালেন। খবরের কাগজে বেরুলো উদীয়মান যুবকের শোচনীয় আত্মহত্যা, কারণ অজ্ঞাত।’

অদ্ভুত কাহিনী শুনে আমরা স্তম্ভিত। নীরব। কিন্তু সেই ইংরিজী জানা ভক্তলোক সহজে থামবার লোক নন। তিনি কৌজদারী উকিলের মত জেরা করবার ভঙ্গীতে বললেন ‘তেরো নম্বর পাঁঠা ভক্তলোক তাঁর স্বপ্নের কথা যদি আগাগোড়া গোপনই রেখে থাকেন তাহলে হাউ ডিড ইউ নো ইউ অ্যাট্ অল্? আপনি জানলেন কি করে? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ…… ! ! !’

সে হাসিতে আরো ছ’চারজন যোগ দিলেন। কিন্তু বৈশীক্ষণ নয়। সেই গল্প-বলিয়ে ভক্তলোক তাঁর ঐ আধো-অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর গা-ছদ্মকর্ম-করানো রহস্যময় কণ্ঠে বললেন ‘বন্ধুগণ! বলবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনারা যখন আমার কাহিনী বিশ্বাস করছেন না, জেরা করে কোণঠাসা করতে চাইছেন, তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা গুহুন।’

এখন যেন একটা ধোমা বিস্তারণ হবে, এমনি ভাবে আমরা নীরব হয়ে কান পেতে রইলাম।

ভক্তলোক বললেন ‘বন্ধুগণ! আমিই সেই তেরো নম্বর পাঁঠা।’

সেই সঙ্গে মাথার ওপর বটগাছের ঘন পাতার আড়ালে একটা প্যাঁচা বিকট আওয়াজ করে ডেকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে পাখা ঝাপটালো।

কয়েকটা বাহুড়। মনে হলো গল্প-বলিয়ে উজ্জলোক সেই সঙ্গে বিকট
হেসে উঠলেন। তারপর তাকে আর দেখা গেল না। ততক্ষণে একটা
ট্রেন এসে গেছে ইস্টিশানে, একদল যাত্রী আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে
মহাকালীর মন্দিরের দিকে।

কেউ কেউ রাম নাম জপতে লাগলেন ভূতুড়ে ব্যাপার ভেবে। কেউ
কেউ ভাববার চেষ্টা করলেন লোকটা এই যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গেছে।
হয়তো যাবে মহাকালীর মন্দিরে তেরো পাঁঠার বলি দেখতে।

আমার হাত ধরে কেঁদে পড়লো জনার্দন। বললে এর একটা
কিনারা করতেই হবে আপনাকে প্রভু। ব্যাপারটা ভূতুড়ে বলে গুজব
রটে গেলে সন্ধ্যার পরে আমার সন্ধ্যাইথানায় ভরেও কোনো খবরের ভিড়বে
না। আপনি ওকে খুঁজে বার করুন প্রভু। উনি নিশ্চয় গোছেন
বলি দেখতে। কোন্ ঠাঁকে কেটে পড়েছেন আমরা কেউ টের
পাইনি।

আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস জনার্দনের। বললুম ‘আচ্ছা। দেখি
খুঁজে বার করতে পারি কিনা।’

মহাকালীর মন্দিরে গিয়ে যখন পৌঁছলুম ততক্ষণে তেরোটি পাঁঠা
স্বপ্নচাঁং হয়ে গেছে। আমি সেই রহস্যময় উজ্জলোকের চোখের প্রশং-
সনে মনে করবার চেষ্টা করে সেই লোকের ভিত্তর ভেতরা থেকে তাঁকে
খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

আমার জ্ঞান গরু খোঁজা খুঁজতে দেখে এক মহানর বেহালাসেবক
গুথালে ‘আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?’

আমি বললুম ‘হ্যাঁ। তেরো নম্বর পাঁঠা।’

বেহালাসেবক বললে ‘সে জে এই একটু আগেই ব্যাচাঁং হয়ে গেল।’

আমি বললুম ‘ও নয়। এ আরেক তেরো নম্বর পাঁঠা। চোখে
চশমা, চুল কৌড়ানো, গাঁব সন্ন—’

হোকরা আমার দিকে চেয়ে হেসে চলে গেল। আমি খুঁজতে

লাগলুম। সে খোঁজা আজও শেষ হয়নি।

*

*

*

মেঘলা দিন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বাইরে। ঘরে বসে বসে একটা বড় গল্পের প্লট ভাবছি। কল্পনার শ্রোত বয়ে চলেছে ছ-ছ করে।

রাত্রি দশটা। বিখ্যাত শিল্পপতি এবং কোটিপতি বজ্রবিনোদ বনার্জী তাঁর একান্ত ঘরে একা পায়চারি করছেন অধীর সিংহের মতো। ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়িতে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে দরজার বৃকে টোকার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

“এসো।” ছদ্মকার ছাড়লেন বজ্রবিনোদ।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল একজন যুবক। বেশ লম্বা, বেশ চওড়া, বেশ বেপরোয়া, যেন ভক্ততা জানে অথচ কাউকে ভয় করে না।

রহস্যমাখানো ভারি কি হাসি হেসে বজ্রবিনোদ বললেন “এলে ? আমি আশংকা করেছিলাম জেনে শুনে সিংহের খাঁচায় এসে ঢুকতে তুমি সাহস পাবে না।”

“সিংহকে শেয়াল হয় তো ভয় করতে পারে, কিন্তু রয়েল বেংগল টাইগার করে না।” বলার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি বৃক ফুলিয়ে দাঁড়ালে হয় তো ভালো হতো, কিন্তু তা সে দরকার মনে করলে না। অতটা সম্মান ও যেন দিতে চায় না বজ্রবিনোদকে।

“শুনে বড় খুশী হলাম। বাংলাদেশে এখনো বাঘ আছে তা’হলে ? রামধারী !” বললেন বজ্রবিনোদ ! দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো রামধারী দারোয়ান।

“বাইরে থেকে এ ঘরের একমাত্র দরজায় তালা লাগিয়ে দাও। আমি না বললে খুলবে না।” বললেন বজ্রবিনোদ।

চলে গেল “যো ছকুম” বলে রামধারী।

সেই যুবকটি তখন যেভাবে অবলীলাক্রমে একটা সোফার ওপর বসে

পড়ে যুঁহ হাঙ্গল তাতে মনে হল যেন বলতে চাইছে “ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় ।”

“জানো তুমি এখন আমার হাতের মুঠোয় ? ইচ্ছে করলে তোমায় আমি পিষে মারতে পারি ?” বললেন বজ্রবিনোদ । বলে যুবকের বিপরীত দিকে একটা বড় টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে পড়লেন ।

যুবকটি এইবার অট্টহাস্ত করে বলল “আপনার ঐ রামধারী দারোয়ানের মত ছ’চারটের মহড়া একা নিতে অনায়াসে পারে এই অপূর্ব সাক্ষাৎ ।” বলে আপন আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিতে চাপড় লাগাল ।

“মুখ যুবক, রামধারী দারোয়ান নয়, আমি এই ছ’হাতে তোমায় পিষে ফেলতে পারি । বয়সে তোমার পিতৃতুল্য হলেও বাহুবল আমার আজ্ঞা অঙ্কুর রয়েছে । দেখবে তার প্রশমাণ ?”

“দেখব ।” বললে যুবক ।

একটা মোটা লোহার ডাঙা মেঝের ওপর নীরবে গুয়েছিল বজ্রবিনোদের পায়ের কাছে । সেটি অনায়াসে তিনি বাঁ হাতে তুলে নিলেন । তারপর রামচন্দ্র যেমন করে হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন, তেমনি ভঙ্গীতে ডাঙাটিকে তিনি শুধু হৃদিকে ছহাতের চাপ দিয়ে বাঁকিয়ে ফেললেন অর্ধবৃত্তের আকারে ।

কিন্তু যুবকের মুখে-চোখে এক ফোঁটা ভয়ের চিহ্ন দেখা গেল না । সে বললে “এ সব বাজ্রে ব্যাপারে সময় নষ্ট না করে কাজের কথা শুরু করুন । আমাকে ভয় দেখাবার বুখা চেষ্টা করবেন না । কেন ডেকেছেন আমাকে ?”

“তুমি আমার কারখানার কর্মীদের আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বানিয়ে তুলবার চেষ্টা করছ, এ কথা সত্যি ?”

“এ কথার জবাব আমি দেবার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব আপনি দিন । আজ লক্ষ লক্ষ টাকা আপনার কাছে খোলামকুচির

মতো। অথচ একদিন আপনি ছিলেন সর্বহারা পথের পথিক, কত রাত্রি কত দিন আপনাকে শুধু কলের জল খেয়ে কাটাতে হয়েছে, একবার কুখার তাড়নায় এক ডজন বিকৃত চুরি করে আপনাকে হাঙতে বাস করতে হয়েছিল, আর একবার—”

“খামো, অর্ধাচীন যুবক। অতীতের প্রস বর্তমানে একাত্তই অবাস্তব।”

“কত বাস্তবের মুখোমুখি হবার সাহস যদি নেই, তাহলে কোন ভরসায় আপনি ডেকে এনেছেন অপূর্ব সাত্তালকে? সত্যের জগৎ অপূর্ব সাত্তাল প্রাণ দিতে পারে, প্রাণ নিতেও পারে। প্রমাণ চান তো এই মুহূর্তে দিতে পারি। আপনি ভীরু, আপনি কাণ্ডাক্ষ, আপনি—”

“সাবধান যুবক!” লিহের মত ছকার ছাড়লেন বজ্রবিনোদ। যুবক অপূর্ব সাত্তাল চেয়ে দেখল তার বুক লক্ষ্য করে পিঙ্কল উচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বিপুলকায় বৃদ্ধ, তাঁর দুই চোখ থেকে যেন আগুনের কোয়ারা বয়ে পড়ছে।

“মৃত্যুর জগৎ প্রকৃত হও অপূর্ব সাত্তাল।” বলতে লাগলেন বৃদ্ধ। “সত্য বলছি তুমি। পথের ভিখারীই ছিলাম একদিন। বহু লাঞ্ছনা, বহু অপমান, বহু অবহেলা সইতে হয়েছে বহুদিন, বহু সাত্তাহ, বহু মাস, বহু বছর। তারপর একদিন সহসা সুযোগ এলো নিত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। পথ পেলাম অর্থ উপার্জনের। সেই থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় গড়ে তুললাম অতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ সারা দেশের অগ্রভাগ সেরা কারখানা, যার একক মালিক—আমি, বজ্রবিনোদ বনার্জী, যার স্বপ্ন এখনো শেষ হয়নি, যে এখনো স্বপ্ন দেখছে এ কারখানা যে আরো আরো বড় বানিয়ে তুলবে যে পর্যন্ত না এ কারখানা সারা এশিয়ায়, তথা সারা বিশ্বে—”

“কিন্তু আমিকালের তুলিয়ে রেখে আসল রক্ত ছিলে জিলে শোষণ করে আসল বৃকের অস্থির ওগল আরো বিল্ডিং করখানার পত্তন করবার

কল্প আপনি দিয়ারাজি যতই দেখুন, অপূর্ব সাত্ত্বাল অধিকৃত থাকতে
তা কখনো কখনো হবে না।”

“তা জানি। আর সেই জগেই তোমাকে স্নান করে এনেছি।
তোমায় আমার প্রসাদোপম অট্টালিকার এই নিভৃত কক্ষে হত্যা করব
বলে। তারপর তোমার মৃতদেহ এই কক্ষের পেছনের ভূমিখণ্ডে সমাহিত
করে তার ওপরকার মাটিতে ছড়িয়ে দেবো সবুজ ঘাসের বীজ। ইষ্টনাম
স্মরণ করো অপূর্ব।”

কিন্তু অপূর্ব সাত্ত্বালের ইষ্টনাম স্মরণ করার কোনো লক্ষণ দেখা
গেল না। সে বললে “বজ্রবিনোদ বনার্জী মহাপুরুষ বা বীরপুরুষ,
এ সন্দেহ মনে কোনোদিন উকি দেয়নি, কিন্তু তিনি যে মহা কাপুরুষ
এও জানা ছিল না।”

“কাপুরুষ ? ? ?” চিৎকার করে উঠলেন বজ্রবিনোদ। সেটা তাঁর
ছকার, না আত্মনাদ বোঝা গেল না।

“আমন্ত্রিত নিরস্ত্র অতিথিকে বাগে পেয়ে তার বক্ষ লক্ষ্য করে পিস্তল
চালাতে উত্তত হুগ্লাকে মহাবীরত্বের লক্ষণ বলে আশা করি আপনিও
দাবি করবেন না ?”

“তবে এই নাও পিস্তল, ভীক যুবক। যদি সাহস থাকে, হত্যা
করো আমাকে। হত্যা করে আমার পেছন দিকের জানালা দিয়ে
বাগানে লাঙ্গির পুড়ে যেখানে শুলি পালিয়ে যাও, কেউ তোমায় গ্রেপ্তার
করবে না। এই নাও পিস্তল।”

অপূর্ব সাত্ত্বালের হাতে পিস্তলটি গুঁজে দিলেন বজ্রবিনোদ। তারপর
বুকের জামা খুলে চিৎকার করে উঠলেন “মারো মারো মারো আমাকে
অপূর্ব। চালাও গুলি।”

পিস্তল উচিয়ে কাঁড়াল অপূর্ব। ছুই চোখে তার গভীর একাগ্র দৃষ্টি।
কেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি একটি পোকাকে লক্ষ্য করছিল ; সে থমকে
থমে রইল। কেয়াল-ঘড়ির পেঙ্কলাম ফুলতে লাগল টক্ টক্ টক্।

কিন্তু গুলি চালান না অপূর্ব সান্ত্বাল। পিস্তলটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে “ছিঃ! কি ছেলেমানুষি করছিলেন বলুন তো? খোঁকের মাথায যদি ঘোড়া টিপে বসতুম?”

বজ্রবিনোদ বললেন “মূর্খ! মূর্খ! মূর্খ! পিস্তলে একটিও টোটা ভরা নেই।”

একটু থেমে বললেন “আর ঐ যে ডাঙাটি দেখেছো, যাকে অবলীলাক্রমে বাঁকিয়ে ফেললাম, ওটি তোমার হাতেও অবলীলাক্রমে বেঁকে যেতো। ওটি সীসের তৈরি, সার্কাসী মেকি পালোয়ানদের পালোয়ানী খেলা দেখাবার জন্তে।”

যুবক কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল “আপনার স্ত্রীর যখন মৃত্যু হয় তখন আপনি ভাগ্যের সন্ধানে ঘুরছিলেন। আপনার একমাত্র সন্তান, একমাত্র পুত্র, মাত্র ছবছর বয়সে মাতৃহারা হয়েছিল। আপনি অর্থোপার্জনের সرف় রাস্তা বেয়ে তারপর যখন এলেন স্ত্রীর সন্ধানে, তখন শুনলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে, আর তাঁর পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে এক পুত্রকামী পুত্রহীন ব্যক্তি তাকে নিয়ে পালিয়েছে। সত্য একথা?”

“সত্য। কিন্তু তুমি কি করে এ খবর পেলে অপূর্ব? কার কাছে?”

“অতি বিশ্বস্তসূত্রে। আপনি আশা ত্যাগ করলেন না। ধনকুবের হবার সাধনায় মেতে গেলেন এই আশায় যে, সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে আপনি এক দিন না এক দিন ফিরে পাবেন, আর সে এসে আপনার এই অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করবে। সত্য?”

“সত্য। কিন্তু—”

“কিন্তু নয়। সেই একমাত্র পুত্রের হাতে অতুল ঐশ্বর্য তুলে দেবার জন্তে আপনি পুঁজিবাদের সব রকম হীনতা নিজের ভেতরে জড়ো করেছেন। আমি পণ করেছি প্রাণপণে বাধা দেবো আপনার শোষণে। আমার জীবনে কোনো বন্ধন নেই, পিছুটান নেই, তাই প্রাণের মায়্যাও আমার

অল্প, মৃত্যুভয় নেই বললেই চলে । বিশ বছর বয়সে যাকে হারিয়েছি তিনি মৃত্যুকালে বলে গেছেন, যদিও তাঁর পদবীই জোড়া রয়েছে আমার নামের শেষে, তিনি আমার পিতা নন ।”

“তবে কে, কে, কে তোমার পিতা, অপূর্ব ?” আত্মকণ্ঠে বলে উঠলেন বঙ্কবিনোদ ।

“সে কথা তিনি বলে যেতে পারেন নি ।” বললে অপূর্ব সাত্তাল ।

—কিন্তু ঐ আসছেন শেঠ কিশোরলাল ভরদ্বাজ আমারই ঘরের দিকে লক্ষ্য করে । গল্পের প্লট তাহলে আজ এ পর্যন্তই থাক ।

“আপনার কাছে ছুটে এলাম, ধনপতিবাবু ।” বললেন শেঠ কিশোরলাল ভরদ্বাজ । “পালিয়ে এলাম ঘর ছেড়ে ।”

“কেন ?”

“রেডিও-তে সানাই বাজছিল আমার ঘরে ।”

“তাই পালিয়ে এলেন ?”

“তাই পালিয়ে এলাম । দূর থেকে শুনব বলে ।”

“কিন্তু আমার কাছে কেন ?”

“আপনাকে শুনাব, আপনার সাথে শুনব ।”

বললেন শেঠজী আমার পাশে । দূর থেকে ভেসে আসছিল সানাই-সঙ্গীত ।

“তিলক কামোদ বাজাচ্ছে মকবুল হোসেন ।” বললেন শেঠ কিশোরলাল ভরদ্বাজ । “বুড়ো বাজিয়ে । সেরা বাজিয়ে । খেয়ালী বাজিয়ে । স্পেশাল প্রোগ্রাম । আধ ঘণ্টা বাজাবে ।”

থেমে রইল—আমার গল্পের প্লটের অগ্রগতি । “কে—কে—কে তোমার পিতা, অপূর্ব ?” এই এক প্রশ্ন তানপুরার একটানা ঝংকারের মতো ঝংকৃত হতে লাগল কোটিপতি শিল্পপতি বঙ্কবিনোদ বনার্জীর হৃদয়ে ।

“সে কথা তিনি বলে বেতে পারেন মি।” নির্ভীক ভরুণ অশ্রু মাছালের আঁচিলি ইকি বকের ভেতর খনিত হতে লাগল এই জবাব।—আমি মন্তমুখ হয়ে শুনে লাগলাম শেঠজীর ঘরের বেতারযন্ত্র থেকে ভেসে-আসা তিলক কাম্বাদ, বাজাছে মকবুল হোসেন সানাই-ওলা।। বুড়ো মকবুল।

মন্তমুখ না হয়ে উপায় ছিল না, কারণ একবার কথা কইবার জন্য মুখ খুলেছি কি না খুলেছি অমনি নিজের হুঁটি জোড়া ঠোঁটের ওপর ডান হাতের তর্জনী চেপে শেঠজী ইশারা করলেন “চুপ!” আর বাঁ হাতে বাঁ কানের রক্তের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝালেন “শুনুন।”

দেশলাম, চলছিলিয়ে উঠেছে শেঠজীর হুঁটি চোখ। বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁদছে মকবুল হোসেনী সানাই-র তিলক কাম্বাদ। তার পেছনে পৌঁ-ধরা বাঁশীর একটানা একঘেয়ে সুর, আর তার-ই সঙ্গে তালের বাঁধনের ভেতর বৈচিত্র্যের মুক্তি খুঁজে চলেছে তবলচীর তেরেকেটে।

আধ ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। কিন্তু কেটে গেল।

“সানাই বাজিয়ে চুল পাকিয়েছে মকবুল হোসেন।” বললেন শেঠ কিষণলাল ভরদ্বাজ। “অবশ্য চুল ওর এমনিতেও পাকত। কিন্তু এমনিতে পাকায়নি মকবুল। এইখানেই ওর ট্রেড সিক্রেট। আপনি হয় তো জানেন না, মকবুলের বাবার ছিল মাংসের দোকান, ঐ দোকানে অনেক পাঁঠা আর অনেক খাসি কেটে কেটে ওজন দরে বেচেছে মকবুলের বাপ ছামিহুল।”

“এত খবর আপনি শুনলেন কোথায়?”

“মকবুল হোসেনের মুখে।” বললেন শেঠ কিষণলাল। “শঙ্কুস্তলার বিয়েতে সানাই বাজাবার জন্তে ওকে আড়াই হাজার টাকা দান দিয়ে রেখেছিলেম। কড়ার ছিল গোটা আষাঢ় মাসটা অপর কোনো বিয়েতে সানাই হোবে না মকবুল, আর আষাঢ়ের পরলা

তারিখেই, ঠিক করেছিলাম, শকুন্তলার বিয়ে হবে।”

“আপনার মেয়ে শকুন্তলা?”

“নয় তো। কি পরের মেয়ের জন্তে আমি সানাই বায়না করব, ধনপতিবাবু? তারপর শুভুন। শকুন্তলাকে বলিনি আমার মন্তলবের কথা। বেটি গরীবের ছেলে দুয়স্তু তেন্দুলকারকে ভালোবেসেছে বেশ করেছে, আমার নারাজ হবার কি আছে তাতে? দুয়স্তু গরীবের ছেলে আছে তো কি আছে, তাকে রাতারাতি বড়লোকের জামাই বানানো তো আমার এক তুড়ির কারবার। কিন্তু জানেন তো, শেষটা দুয়স্তু ছোকরাই বিলকুল ভেগে গেল, আমার বেটি শকুন্তলার মন ভেঙে দিয়ে। মূর্খ, বেকুব, উজবুক দুয়স্তু তেন্দুলকার।”

“তাকে কি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন মেয়ের মুখ চেয়ে?”

“কাগজে কাগজে দুয়স্তু ফিরে এসো বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে? হয়তো তাই করতাম, কিন্তু করতে দিত না শকুন্তলা। বলত, কাজ নেই বাবা, যে চলে গেছে তা’কে চলে গিয়েই থাকতে দাও। ভালোবাসার মান দিতে যে পারলে না তা’কে ডেকে ফেরাবার অপমান ডেকে আনতে রাজী হত না শকুন্তলা। তাই বেটিকে বললাম, পয়লা আবাড়ি গুর হাত আর লছমনপ্রসাদ ঠনঠনিয়ার নাতি রামমনোহর ঠনঠনিয়ার হাত, এই দু’হাত এক বানিয়ে দিই, কিন্তু জ্বর রকম নারাজ হল শকুন্তলা। বাতিল করে দিলে পয়লা আবাড়ি, বাতিল করে দিলে বিয়ের কথা। তখন খবর পাঠিয়ে দিলাম মকবুলকে চুক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে, জানিয়ে দিলাম হবে না শকুন্তলার বিয়ে, বাজাতে হবে না সানাই আমার গরীবখানার, ইচ্ছে হলে সারা আবাড়ি মাস যেখানে খুশি সেখানে যত খুশি সানাই বাজাতে পারে। তখন মকবুল কি করলে জানেন?”

“জানি নে।”

“একদিন আমার বাড়ি এসে হাজির, পাঁচশখানা একশো টাকা’র নোট নিয়ে। বললে, ফেরত নিতে হবে। বাজানোর ব্যবস্থা যখন

বাতিল হয়ে গেল তখন বায়নার টাকা রাখবে না মকবুল হোসেন সানাইওয়াল। কিছু না দিয়ে কিছু নিয়ে নিজেকে খেলো বানাতে রাজী নয় সে। অথচ আমারও জেদ যে টাকা একবার দিয়েছি সে টাকার একটি আখলাও ফেরত নেবো না।”

“তারপর?”

“একটা রফা করলাম যাতে ছুঁয়েরই জেদ বজায় থাকে, কারো মান খোয়া না যায়। ঐ আড়াই হাজার টাকার বদলে ওর সানাইওয়াল হবার ইতিহাস শোনাতে মকবুল একদিন সারা হুপুরবেলা। সে অনেক লম্বা কাহিনী। তার দাম আড়াই হাজার টাকার চাইতে ঢের বেশী। জিত হলো আমার, বললাম মকবুলকে। চলে গেল মকবুল টাকা ফেরত নিয়ে। পরে গুনলাম ও টাকা সে রাখে নি, দান করে দিয়েছে এক দাতব্য হাসপাতালের ফাণ্ডে।”

“কিন্তু কি কাহিনী আপনাকে শুনিয়ে গেল মকবুল হোসেন?”
গুথালেম আমি।

“সে কথা গুছিয়ে বড় করে শোনাব আপনাকে একদিন।” বললেন শেঠ কিশোরলাল। “আজ ছোট করে বলি শুধুন।”

শোনালেন ছোট করে সেই কাহিনী। পাঁঠা-খাসির মাংসের দোকান ছিল মকবুলের বাপ হামিটুলের। মাংসের কিমা বানাবার বাদশা ছিল হামিটুল; ও ব্যাপারে সারা শহরে জুড়ি ছিল না তার। হিন্দু-মুসলিম মিলনের একটি পাকা কেন্দ্র ছিল হামিটুলের মাংসের দোকান। হিন্দু পাঁঠা মুসলিম পাঁঠার যেমন ভেদ ছিল না হামিটুলের কাছে, তেমনি ছিল না এই দুই ধর্মের খদ্দেরে খদ্দেরে। পাঁঠার পর পাঁঠা, খাসির পর খাসি খণ্ডিত হয়ে চলে যায় খদ্দেরের ঘরে, হু-হু করে খদ্দেরের অর্থ আসে হামিটুলের টাকাকে। কিন্তু ছুঁহাতে টাকা ফুঁকে দেয় হামিটুল, বেহিসেবি, বেপরোয়া, মহা উড়নচণ্ডী। একটু বাবুয়ানার শখ। দামী সিক্কের লুজি, দামী জমকালো নাগরা, দামী সিক্কের পাঞ্জাবি পরে আতরের

খুশবু ছড়িয়ে গৌঁকে তা দিয়ে যখন বেড়াতে তখন তাঁকে দেখে কেউ
কল্পনাও করত না এই হামিটুলই দোকানে বসে তাজা জানোয়ার জবাই
করে তাদের মৃতদেহ আপন হাতে টুকরো করে, কুচিয়ে কাটে ।

জঘন্না গলার আওয়াজ হামিটুলের, সুরতালের ত্রিসীমানাও মাড়ায়
না কখনো । হঠাৎ একদিন কি খেয়াল চেপেছিল, গিয়েছিল এক
ঘরোয়া গান বাজনার আসরে, বদরুদ্দীন সাহেবের বাড়ির ভেতরের
উঠানে । সঙ্গে তার বাচ্চা ছেলে মকবুল । আসরের কয়েকজন তাকে
কোনো গাইয়ে বা বাজিয়ে বলে ভুল করে খাঁ-সাহেব বলে সম্বোধন করে
ফেলেছিল । সাময়িক ভুল বটে, কিন্তু মজা লাগার সঙ্গে সঙ্গে একটু
আফসোসও হয়েছিল হামিটুলের । ফিরবার পথে বলেছিল মকবুলকে
“খাঁ-সাহেব হবার রাস্তা খোদা দেননি । কিন্তু তুই ব্যাটা আমাকে
খাঁ-সাহেবের বাপ বানাতে পারবি নে ?”

মকবুল তখন অতশত কিছু ভাবেনি, অনায়াসে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে
বলেছিল “আলবাৎ পারবো আব্বাজান ।”

“সাবাস !” বলে ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল হামিটুল ।

এরপর বেশীদিন বিগত হবার আগেই এক খুনের মকদ্দমায় নিজেকে
জড়িয়ে ফেলে হামিটুল । নৃশংস খুন । হামিটুলের সহ-আসামী
বেকসুর খালাস পেয়ে গেল হামিটুলের বিস্তৃত স্বীকারোক্তিতে, হামিটুলের
হলো কাঁসির ছকুম । অনেকে এক বাক্যে বললে “ব্যাটা কসাই ।”
অনেকে খুশী হলো ওর কাঁসির ছকুমে, কিন্তু খুশী হলো না আসামী
পক্ষের উকীলবাবু । তিনি একরকম অনায়াসেই বাঁচাতে পারতেন
হামিটুলকে, নির্ঘাত বুলত হামিটুলের সহ-আসামী । কিন্তু হামিটুলের
জেদে, হামিটুলের শাসানিতে বাধ্য হয়ে তাঁকে এমন মকদ্দমা চালাতে
হল যাতে হামিটুলের ওপর সকলের সন্দেহ একেবারে দৃঢ়বিশ্বাসে
পরিণত হয় । উঠতি বয়সের জোয়ান ছোকরাকে তার হঠাৎ করে-
ফেলা দুষ্কর্মের নিশ্চিত চরম শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্তে, তার চাইতে

বেশি একটি আশ্রয়স্থান সন্ধান কিশোরীকে নির্ভর বৈধব্য থেকে বাঁচাবার জন্যে দড়ির কাঁসের তেতুর আশ্রয় চেষ্টায় গঙ্গা বাড়িয়ে দিলে খ্রৌড় ‘কসাই’ হামিছিল।

হামিছিলের কাঁসি হয়ে গেল একদিন শেষ রাতে জেলের প্রাচীরের আড়ালে কাঁসি কাঠে। মকবুল হোসেন তখন বালক। কবে কখন কাঁসি হবে জানা ছিল মকবুলের। আর জানা ছিল খুন না করে ইচ্ছে করে খুনের দায় খাড়ে নিয়ে পরের জান বাঁচাতে নিজের জান দিচ্ছে আক্বাজান, আক্বাজান মরতে ডরাচ্ছে না এতটুকু। অনেক পাঠা-খাসির জান নিয়েছে অনায়াসে, এবার নিজের জানও দেবে অমানবদনে।

জেলখানার উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে সরু ঝাল। খালের ওপর ঝুলছে সেতু, তার ওপর দিয়ে তখনো শুরু হয়নি যানবাহনের যাওয়া আসা। সেতুর মাঝামাঝি কিনারা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো মকবুল।

রহমান চাচা বোধকরি বাড়িতে বসে হুটখুট করছেন ভাই-জানের জন্ত। তাকে না জানিয়েই চুপি চুপি গালিয়ে এসেছে মকবুল জেলখানার ধারে এই সেতুর ওপর।

শেষ রাত্রেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোথায় যেন ঢং ঢং করে বেজে উঠল ঘড়ির ঘণ্টা। সময় হয়েছে, এবার কাঁসির তক্তার তুলেছে আক্বাজানকে। খোঁকার কাছে প্রার্থনা জানালে মকবুল, আক্বাজানের জন্তে।

এমনি সময় দূরে কোথায় বেজে উঠল সানাই। “গিয়া মিলনকী আস” গানের সানাই বাজছে ভোরাই যোগিয়া রাগিণীতে। আশ্চর্য করুণ, আশ্চর্য মধুর সানাইর সুর, ঐ সুর কানে নিয়ে শেষ যাত্রাপথে রওনা হয়ে যাবে আক্বাজান, আশ্রাজান ওপারে প্রতীক্ষা করছে তারই জন্যে। গিয়া মিলনের আশ্রয় এপারের সীমানা ছাড়িয়ে ওপারে রওনা হয়ে যাচ্ছে আক্বাজান, তার কানে শেষ মধু বরাবে বলে বাজছে সানাই।

সেই মুহূর্তে সেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে মকবুল অপথ করলে সানাই

সঙ্গীতের বাজকর ইহার সাধনার উৎসর্গ করবে নিজের সারা জীবন।
খাঁ সাহেবের বাপ হতে চেয়েছিল আব্বাজান; তার সে সাধ অপর
রাখা চলবে না। সানাই-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতেই হবে—তার
এপারের সানাই মুক্ত হয়ে শুনে তৃপ্ত হবে আব্বাজান ওপার থেকে।

আমি বললাম “বিশ্বাস করা শক্ত, শেঠজি।”

“কোন কথাটা?”

“ঐ যে বললেন সানাই-সম্রাট মকবুল হোসেনের বাবার ছিল
কসাই-দোকান।”

“একটা কথার মত কথা বলেছেন ধনপতিবাবু।” খুশী হয়ে
বললেন শেঠ কিশোরলাল। “বাস্তবিকই বিশ্বাস করা শক্ত। ছুনিয়ার
অনেক মিথ্যে কথা বিশ্বাস করা যেমন সোজা, অনেক সত্যি কথা বিশ্বাস
করা তেমনি শক্ত। আচ্ছা, মকবুল হোসেনের সানাই তো শুনেছেন?”

“শুনলাম। আগেও অনেক শুনেছি।”

“শুনে কেমন মনে হয় সানাই ওস্তাদকে?”

আমি বললাম “শেক্সপীয়ারের নাম শুনেছেন?”

“শুনি নি।”

“ইংরেজ কবি। যিনি এক জায়গায় লিখে গেছেন সঙ্গীতে যে রস
পায় না সে মানুষ খুন করতে পারে। সে মানুষ বিপজ্জনক, তাকে
খবরদার বিশ্বাস করবেন না।”

“সঙ্গীত-মাতাল মানুষও খুন করতে পারে, এ কথা শেক্সপীয়ার
কোথাও লিখে গেছে?”

“না, এমন কথা লেখেন নি তিনি।”

“তা হলে উজবুগ, উজবুগ, একদম উজবুগ লোকটা।”

“কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের সেরা সেরা মাতব্বর—কোলরীজ, মাথু
আরনলড্ ডাউডেন, ব্রাড্‌লি, স্টপফোর্ড ব্রুক, আরো আরো আরো
অনেকে—একবারো চিৎকার করে বলেছেন মহামতি শেক্সপীয়ার

মানব-চরিত্রকে একেবারে গুলে খেয়ে হজম করে রেখেছেন।”

“ওগুলো তাহলে শেক্সপীয়ারের চাইতে আরো বড় গবেট।” বললেন শেঠজী।

শেক্সপীয়ারের প্রতি শেঠ কিশোরলালের এই মর্মান্তিক তাল্হিল্যো মর্মান্ত হযে বললাম “শেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী হচ্ছে মানব চরিত্রের বিরাট চিড়িয়াখানা, এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা।”

আরো গম্ভীর তাল্হিল্যোর হাসি হেসে শেঠজী বললেন “মানব-চরিত্র জ্ঞানবার জন্তে যেদিন এই ইংরেজ চিড়িয়াখানা-ওয়ালার পুঁথি পড়ার দরকার হবে ধনপতিবাবু, তার আগে ডিসপেনসারি থেকে এক ডোজ পর্টারিয়াম সায়ানাইড আনিযে নিব। ছেড়ে দিন ওর কথা। মকবুল-চরিত্র কি বুঝবে আপনার শেক্সপীয়ার?”

শেক্সপীয়ারের পক্ষে শেঠজীর আদালতে আর ব্যারিস্টারি করতে অগ্রসর হলাম না।

“হাওয়ায় হাওয়ায় অমৃত ছড়িয়ে দেয় মকবুল হোসেনের সানাই।” বললেন শেঠজী। “মনে হয় স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে সুর, এমন মিঠে সুর যে সৃষ্টি করে সে মানুষটা বুঝি কত মিঠে। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন ধনপতিবাবু, সানাই বাজাচ্ছে যে মকবুল সে এক মানুষ, আর সানাই ছাড়া মকবুল হোসেন বিলকুল আলাদা মানুষ। মানুষ খুন না করে কাঁসি গেছে মকবুলের বাপ; মকবুল যদি মানুষ খুন করে কাঁসি যায় তাহলেও আমি অবাক হবো না।”

“সে কি? মকবুল হোসেন—”

“হৃদয়হীন, একেবারে হৃদয়হীন লোকটা।” বললেন শেঠজী। “ওর বাপ হামিছল ছিল কসাই, অনেক ইতর প্রাণীকে প্রাণহীন আর ছালহীন করে কুচিয়ে কেটে বিক্রি করেছ, কিন্তু শুনেছি মিঠে মেজাজের মানুষ ছিল সে! দিল ছিল ওর হীরের টুকরো। পাঁঠাখাসীর হুংখে কখনো কাঁদেনি, কিন্তু মানুষের হুংখে হৃদয় কাঁদত হামিছলের। আর

এই কান্নার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টানে ভেদ ছিল না তার। কিন্তু মকবুল—”

“মকবুল...?...?”

“ঐ যে বললাম একেবারে হৃদয়হীন। কটি শাদী করেছিল জানেন?”

“ক’টি?”

“চারটি। তার ভেতর ছটি আত্মহত্যা করেছিল ছ’রকম কায়দায়। একটি গলায় দড়ি, আরেকটি কেরোসিনে স্নান করে তারপর অগ্নিস্নান।”

“কেন?”

“স্বর-যাত্ৰকর স্বামীর অন্তরপনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। বাইরের আসরে, সভায়, সম্মেলনে, মাইফেলে সর্বত্র হাজ্জারো মানুষকে সুরের দোলায় কাঁদিয়ে জয়জয়কার করে বাড়ি ফিরে...কিন্তু থাক্ সেসব পাষণ্ড আচরণের কথা। আপনার ভেঙে যাবে কল্পনার মধুর স্বপ্ন, কোমল হৃদয়ে ব্যথা পাবেন আপনি। স্ত্রীর অসহায় দেহে চাবুক চালিয়েছে সানাই-যাত্ৰকর দিনের পর দিন, এ ধরনের কাহিনী শুনে আপনাদের ভালো লাগবে না।”

“সত্যি বলে বিশ্বাস করাও শক্ত, শেঠজি।” বললাম আমি। “কিন্তু আরো ছটি স্ত্রী বাকী রইল মকবুল হোসেনের।”

“ঐ ছটির মধ্যে এক বিবিকে তালুক দিয়েছিল মকবুল। সে বিবি তারপর কি একটা ব্যামোয় মারা গেল—টাইফয়েড না ম্যালেরিয়ায় মনে নেই, এক রকম বিনা চিকিৎসায়। ইচ্ছে করলে অনেক পয়সাই চিকিৎসার জন্তু দিতে পারত মকবুল—কিন্তু একটি আখলাও দেয়নি।”

“চার নম্বর স্ত্রী?”

“শুনেছি এখনো বেঁচে আছে ফতেমা বিবি। পয়সাওয়ালা বাপের মেয়ে; পয়সাওয়ালা, পসারওয়ালা, হিম্মতওয়ালা বাবা মেজাজের ছ’ভায়ের মাঝামাঝি এক বোন; রূপের জোর, রূপোর জোর আর বাধিনীর মেজাজ

নিয়ে মকবুলের ঘরে এসেছিল ফড়েআ বিবি। এই চার নম্বরের কাছে কাবু হতে বাধ্য হয়েছিল মকবুল হোসেন। এখনো সেই কাবুই আছে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?”

“কি মনে হয়?”

“মকবুল হোসেনের সানাই শুনে আমি আত্মহারা মাতাল হয়ে উঠি, চোখের জল রাখতে পারিনে। কিন্তু ওর সানাই শুনে যত বেশী মুগ্ধ হই তত বেশী মনে হয় এখনো প্রয়োজন হলে অনায়াসে আপন হাতে মানুষ খুন করতে পারে মকবুল। সানাইতে যেমন মীড় তোলে অনায়াসে, তেমনি অনায়াসে—অবশ্য ধরা পড়ে কাঁসি যাবার ভয় না থাকলে। কিন্তু থাক্ এখন মকবুল হোসেনের কথা। বসে বসে একটু মেঘলা আকাশ দেখা যাক।”

আমি বললাম “দেখুন।” বসে বসে মেঘলা আকাশ দেখতে লাগলেন শেঠ কিশোরলাল ভরদ্বাজ।

নবাব উজ্জবেক আলী খাঁ বলছিলেন আর আমি শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন : “আজ-কাল এই যে-কামরায় আমার থাকতে হচ্ছে, আমার এক একটা বাবুর্চি খানসামা থাকতো এর তুলনো কামরায়। সে সব কি দিন ছিল, আর এই কি দিন। লালন ফকির ঠিকই বলেছিল : আয়সা দিন নেহি রহেগা।.....

“আজ দেখছেন চুল সাদা, দাড়ি সাদা, চেহারার সে জলুস নেই। অথচ একদিন ছিল যখন কত বিবি আমার জন্তে দিওয়ানা হয়ে যেতো। আমার গরীবখানার নাম ছিল খুশ জাহান। তে-মজ্জিলা ইমারত, আগা-গোড়া পাথরের তৈরী। চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আমার খুশ জাহান। সামনের দিক দিয়ে ঢুকবার একটিমাত্র ফটক, তার লোহার দরোজা বন্ধ করে দিলে বাইরে থেকে ঢুকবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

“শেহন দিকে একটা মিষ্টি দরজা ছিল লক্ষ্য হুড়োর শেষে ।
 ঐ দরজা খুলে ঘেরোলেই নদী । ঐ হুড়ুর আর ঐ গোপন দরজার
 কথা জানা ছিল শুধু আমার, আর জানতো আলিবাবা ।

“আমার দিল ছিলো পিয়ার আর মুহব্বতে ভরা—যাকে আপনারা
 মিনমিনে জবানিতে বলেন প্রেম । আপনারা একনিষ্ঠ প্রেম বলেন
 তাকে যা একজনকে বরাবর আঁকড়ে ধরে থাকে । কিন্তু আমি বলি
 পিয়ারই বলুন আর মুহব্বতই বলুন তা হচ্ছে নদীর স্রোতের মতো—
 এক জায়গায় জমে থাকলেই তাতে শ্যাওলা জমে যাবে ।

“আমার হারেমে ছিলো পঁচিশখানা আলাদা মহল—এক এক মহলে
 এক এক বেগম আর তার বাঁদী থাকতো । হারেমের মহলগুলোর নম্বর
 ছিল এক থেকে পঁচিশ—আম বেগমরাও তেমনি ছিল এক নম্বরী বেগম,
 দু’ নম্বরী বেগম...এমনি করে পঁচিশ নম্বরী বেগম পর্যন্ত । মহলের
 নম্বর মাফিক সেই মহল-ওয়ালা বেগমের নম্বর হত । হারেমের খোজা
 ছিল আবদুল্লাহর ছেলে আলিবাবা । এ সেই হু-কুড়ি দস্যুর আলিবাবা
 নয়—এ আলাদা । ভারী ইমানদার—যাকে আপনারা বলেন বিশ্বাসী ।
 আর চালাক ! ভারী চালাক ছিল । আমার আর পুরো কথা কইবার
 দরকার হত না—শুধু ইশারা থেকেই সব বুঝে নিত আলিবাবা ।

“আমার হারেমের সুন্দরীরা ছিল বেহেশতের ছরীদের চাইতেও
 খুবসুরত । তাদের প্রত্যেক মহলে ছিল আলাদা গোসলখানা, তাতে
 ছিল গোলাপজলের চৌবাচ্চা, আতরের বরনা, মিশরী সাবান,
 ইস্পাহানের খুশ-বু-ওয়ালা তেল, তুর্কী তোয়ালে, চীনা চপ্পল, ঢাকাই
 মসলীনের ওড়না, ইরানী ধূপ, বসরাই ফুলদানী । গোসলখানার
 পাশেই ছিল নাশ্তা-ঘর ; তাতে হরেক রকমের নিত্য নতুন টাউকা
 ফল সাজানো থাকতো—নাশ্পাতি, আপেল, বেদানা, পেস্তা,
 আখরোট, আনার, আনারস, আঙ্গুর আরো রকমারি মরহুমী আর
 হরদমী ফল ।

‘বিবিদের বিছানা ছিল দামী মখমলের। বিছানার ওপরে—
অনেক ওপরের ছাত আগাগোড়া আসমানী নীল দিয়ে রং করা, যেন
ওপরে তাকালে মনে হয় খোলা ছাতে শুয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে
আছি। মশারির কোনো দরকার হত না—আমার হারেমে কোনো
হারামজাদা মশা মাথা গলাতে সাহস পেত না।

“হারেমের প্রত্যেক বিবির জন্যে একটি করে বীণা থাকত।
বিবির কেউ বড় একটা বাজাতো না, বাজাতে জানতোও না।
বাজাত হারেমের বাঁদীরা। পঁচিশ মহলের পঁচিশটা বাঁদীকে ওস্তাদ
রেখে বীণা বাজনার তালিম নিইয়েছিলাম। বাঁদীরা বীণ বাজাতো।
মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতো আলিবাবা—আমার
হারেমের খোজা। ঘন ঘন তাল কেটে ফেলতো বটে, কিন্তু তবলাটা
তবু বাজাতো ভালো আলিবাবা। বেড়ে আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে
বাজাতো, কানকে জ্বালাতন করতো না।

“গোটা কয়েক বিবিকে গান গাইতে শিখিয়েছিলাম এক গাইয়ে
বাঁজী রেখে। সে গজল আর ঠুংরী গান শেখাতো। যে মহলের
বিবি গাইতে পারতো না, সে মহলের বাঁদী গান শোনাতে বীণ বাজিয়ে,
কখনো বা না বাজিয়ে।

একবার এক হাওয়া-ফুরফুরে রাস্তিরে আসমানে চাঁদের রোশ্নী
জ্বলছে, আর অনেক দূরে না জানি কোন মিঞা বাজাচ্ছে সানাই।
আমি ওমর খৈয়ামের মতো আমার হারেমের এক মহলের চিলে
কোঠায় আঙুরী নেশায় মশগুল হয়ে বসে আছি, আর আমার পাশে
মৌন ভেঙে গুলবদন বিবি তার নিজের গান বাঁদীকে দিয়ে গাওয়াচ্ছে।
সানাই বাজনা একটু জোর খরতেই দেখি গুলবদন বিবির মন ঐ দিকে
পড়ে আছে। বাঁদী কি গাইছে শুনছে না বিবি। ব্যাস, অমনি
আমার মাথায় খুন চড়ে গেল। সে রাতটা চেপে গেলুম। পরদিন
সানাই-বাজিয়ার তল্লাস করিয়ে জানলুম সে আমারি এক তালুকদারের

বড়ো ছেলে। তাকে ডাকিয়ে এনে কতল্ করে গুম্ব করে ফেললুম আমার গুম্বখানায়। আমার হারেমের পেছনেই গুম্বখানা, তার খোঁজ জানতুম শুধু আমি, আর জানত আলিবাবা। তারপর আলিবাবাকে বললুম এবারে গুলবদন বিবিকে কতল্ করতে হবে। আলিবাবা বললে যো হুকুম জাঁহাপনা, কিন্তু আজকাল বিবিদের বাজার স্ত্রবিধের নয়—এক বিবি গেলে তার জায়গায় নতুন বিবি পাওয়া শক্ত। আমি বললুম, কেন? আলিবাবা বললে লড়াই লেগেছে, তাই সব কিছুই এখন কালোবাজার।

“আমি বললুম তা হোক, না হয় হারমে চব্বিশ বিবি থাকবে। তুমি কতল্ করে গুম্বখানায় গুম্ব করে দাও, আর না হয় তো স্ত্রড়ঙ্গের রাস্তায় খিড়কি ছুয়োর দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দাও।

‘তাই করে আলিবাবা বললে তাই করেছি জাঁহাপনা। শুনে খুলী হয়ে আলিকে ইনাম দিলুম একখানা পাকা সোনার আংটি।’

আমি বললাম “তৈরী করিয়ে দিলেন?”

নবাব উজ্জবেক আলি খাঁ বললেন, “না, আমার নিজের তিন শো সাতান্নখানা আংটি থেকে একখানা দিলুম। তারপর তখন আমার হারমে বাকী রইলো চব্বিশ বিবি। আপনি গুনলে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। এর পর আস্তে আস্তে আমার হারেম থেকে একজন একজন করে বিবি কমতে লাগলো। মানে, আমিই কমাতে লাগলুম।”

“কতল্ করিয়ে?”

“হ্যাঁ, কতল্ করিয়ে। বেইমানকে আমি কোনো মেহেরবাগী দেখাতে রাজী নই। তা সে মরদই হোক বা জেনানাই হোক। নবাব উজ্জবেক আলি খাঁ কলিজায় যে চোট পৌঁছাবে বেইমানী করে, তার কোনো মাফ নেই।”

“তারপর?”

“তারপর এক এক করে হারেমের আস্মান থেকে একটা একটা

করে সিঁতারার জরুরি কামে যেতে লাগলো। সিঁতারার মানে জানেন না? আপনারা স্বাক্ষর করেছেন। আমার পঁচিশ-বেগমী হারেমের বেগম কয়েক কয়েক এক বেগমে গিয়ে ঠেকলো—তার মাম ভুল্লমহার বেগম। কেমন, দিলচম্পী নাম কি না? দিলচম্পী মামে বুল্লমেন না? দিলের দোলনার দোলা লাগানো।”

“মানে দিল্ দোলানো নাম আর কি। তা তো নিশ্চয়ই। অদ্বুত হুন্দরী ছিলেন নিশ্চয়ই?”

“খুবহুরত। খুবহুরত। আমি তাই তার আরেক নাম দিয়েছিলাম জরৎ-উম্মিসা। তারপর শুকুন। দিন যায়। রাত যায়। এক নবাব আর এক বেগম। পঁচিশ মহলা হারেমের চব্বিশ মহলা খাঁ খাঁ করে, বেগম নেই, বাঁদীগুলোর শোয়াখারো। তারা গান গায়, বাঁগ বাজায়। পেয়ালার পর পেয়ালার সিরাজী লাভাড করে।.....”

আমি বললাম “বাঁদীগুলোকেই বেগম করে নিলেন না কেন নবাব সাহেব?”

নবাব উত্তরে আলি খাঁ বললেন “একবার তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আলিবাখার জন্তে তা আর হয়ে উঠলো না। সব ভুল করে দিলে সে। কেন বুঝলেন তো? বেগম যত কম থাকবে তাঁর খাফিনিও তত কম। এক বেগম থাকলে শুধু তাকে পাহারা দিলেই হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই একটি বেগমও বাকী রইল না।”

“কোথায় গেল?”

“কতল্ করালুম। বেগমের কাছে একটা চিঠি পেলো আলিবাখা। ভয়ানক চিঠি। আলিবাখা বললে এমন ভয়ানক চিঠি, যে আমাকে কিছুতেই দেখানো চলে না। শুনে মগজে খুন চড়ে গেল। বললুম কতল্ করে গুম করে ফেল। যো হুকুম বলে আলিবাখা চলে গেল। আমি পস্তাতে লাগলুম, আফসোসে মরে যেতে লাগলুম। শেষ বেগমও কতল্ হয়ে গেলে আমার হারেমের আর রইলো কি? কিন্তু নবাব

উজ্জবেক্ আলি খাঁ যে হুকুম একবার ভুল করেও দিয়ে খেলে তা আর কেন্দ্র নৈর না। জান্ বার সো ভি আচ্ছা, তবু জবানের খেলাপ্ হবে না। কলিজা খান্ খান্ হয়ে গেল, চোখের পানিতে উজন উজন রুমাল ভিজ়ে ভিজ়ে গামছা হয়ে গেল। তা হয়ে গেল তো হয়ে গেল, তবু মুখ থেকে একটা কাঁহুনি জবান নিকললো না।

“তারপর ?”

“আলিবাবা এসে বললে হুকুম তামিল হয়েছে। গুলনেয়ার বেগম ওরফে জন্নত-উয়েসা আর ফিরে আসবে না। এখন রইল শুধু পঁচিশ বাঁদী, বেগম একটিও নয়। যা ছিল হারেম তা হয়ে গেল বাঁদী-মহল। নবাব উজ্জবেক্ আলি খাঁ-র গুলিস্তা হয়ে গেল রেগিস্তা—আপনাদের গিরিশ ঘোষের ভাবায়, সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বিলকুল শুকিয়ে গেল।”

“তারপর ?”

আমার প্রশ্ন শুনে বিষম ক্ষেপে উঠে নবাব উজ্জবেক্ আলি খাঁ চিৎকার করে উঠলেন “আমার পঁচিশ-বেগমী হারেম বাঁদী-মহল হয়ে গেল, গুলিস্তা রেগিস্তা হয়ে গেল, সাজানো বাগান শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেল, এর পরও কিনা বলছেন তারপর ? নিকালো, আভি নিকালো ইহাঁসে। বেওকুফ, বেতমিজ, কমবখ্ ত্.....”

বেগতিক দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ছুট দিলাম নবাব সাহেবের ঘর থেকে। বারাণ্ডায় বেরিয়েই যার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালাম তিনি ঠিক পাশের ঘর থেকেই বেরোচ্ছিলেন।

তিনি হেসে বললেন “নবাব সাহেবের তাড়া খেয়েছেন বুঝি ? ভয় নেই। উনি তাড়া দেন, কিন্তু তাড়া করেন না। ওঁর হারেমের কাহিনী শুনেছেন কি ?”

“জনেছি।”

“পঁচিশ বেগমের কতল্ আর গুলমের কাহিনী ?”

“ঠিক তাই।”

“তাহলে আসল কথাটা শুনুন। একটি বেগমকেও কতল করিনি, তবে এক হিসেবে গুম করেছি বলতে পারেন। মানে বাইরে পার করে দিয়েছি। আমিই আলিবাবা।”

“নবাব উজ্জবেক্ আলি খাঁ-র হারেমের খোজা?”

হো হো করে হেসে উঠলো আলিবাবা। বললে “খোজা নবাব চন্দোর খোজা বলেই আমাকে জানতো নটে। আচ্ছা, আপনি এখন আসুন। কিন্তু খবরদার, নবাবকে যেন এবিষয়ে কিছু বলবেন না। যা আপনাকে দিলাম আসল খবর, তা যেন কখনো ছুঁকান না হয়। সালাম।”

বলে আলিবাবা তার ঘরে ঢুকে গেল। ত্রিলোচন ত্রিপাঠীর সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি বললেন “এরা দুজন এ আশ্রমে নতুন ভর্তি হয়েছেন। নবাব উজ্জবেক্ আলি খাঁ-র নাম হচ্ছে ভবসাগর চৌধুরী, আর আলিবাবার নাম দিগন্তর পাকড়াশী। চৌধুরী বড়লোকের ছেলে, কাপ্তানী করে পয়সা উড়িয়েছে। আর পাকড়াশী তার মোসাহেব ইয়ার, তার কাপ্তানী কারবারের প্রাইভেট সেক্রেটারী। মারাত্মক বা বদ্ধ পাগল নয়, খেয়ালী পাগল বলতে পারেন। একজন ভাবেন উনি নবাব উজ্জবেক্ আলি খাঁ, আরেকজন ভাবেন তিনি আলিবাবা। গুনতে পেলাম থর থর বেহুরো গলায় নবাব উজ্জবেক্ আলি খাঁ গাইছে সিনেমা সঙ্গীতের ভঙ্গীতে :

“হায়্ মেরা দিল্ টুট্ গয়া হায়্, টুট্ গয়া।”

ভোলা যাবে না শকুন্তলা স্ত্রীনাটোরিআমের ভজগোবিন্দ ভোজালীকেও। তাঁকে মাত্র আট আনা খার দিয়ে তাঁর মুখ থেকে যে ভাষণ শুনেছিলাম তাই তার নিজের ভাষায় জবাব জ্বলে রাখছি

আমার এই ডায়েরি খাতায় ।

দশটা টাকা ধার দেবেন দাদা ?.....পাঁচ টাকা ?.....তিন টাকা ?
.....দু' টাকা ?.....এক টাকা ?.....মাত্র আট আনা আছে বলছেন ?
তাই দিন । বাঁচালেন । বড্ড দরকার ছিল ।

কিন্তু ধার দিলে আর শোধ পাবেন না টের পেলেন কি করে ?
আমি যে পাগল নই এও ধরে ফেলেছেন নাকি ? কথাটা ফাঁস করবেন
না দাদা, তাহলে আর এখানে থাকতে দেবে না । এ জায়গা শুধু
পাগলদের জগ্রে কিনা ।

অবিশিষ্ট যে অত্যাচার চলেছে তাতে আর কেউ হলে অ্যাঙ্গিনে নির্ধাত
পাগল হয়ে যেতো ।...আজ্ঞে না, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডাক্তার, নার্স, বেয়ারা,
এদের সবাইকে বরং আমিই ধমকে ঠিক রাখি । অত্যাচার করছেন
আমার পূর্ব পুরুষেরা । এক বছর ধরে অত্যাচার চলেছে, ফি হপ্তায়
এক পুরুষ করে বাড়ছে । ফি শনিবারে সারা রাত আমায় যে কি
হেনস্থা সহিতে হয় দাদা, সে আর কহতব্য নয়..... ।

তা হলে গোড়া থেকেই বলি শুনুন । আমার নাম ভজ্জগোবিন্দ
ভোজালী, আমার ছেলের নাম পরমানন্দ ভোজালী, নাতির নাম গজানন
ভোজালী, বাবার নাম যজ্ঞেশ্বর ভোজালী, ঠাকুরদার নাম কৈলাস ভোজালী,
ঠাকুরদার বাবার নাম—কিন্তু এত নাম আপনি মনে রাখতে পারবেন না
দাদা । শুধু জেনে রাখুন, আমাদের এই ভোজালী বংশ অতি প্রাচীন,
অতি ধার্মিক বংশ, এ বংশের কুলধর্ম হচ্ছে একতরফা ধার নেয়া ।
আমাদের এক পুরুষ, দুই পুরুষ, তিন পুরুষ করে যত খুশি পেছন দিকে
চলে যান, কোনো পুরুষে এমন কাউকে পাবেন না যিনি ধার করেননি,
বা ধার করে সে ধারের একটি আখলাও শোধ দিয়েছেন । আমরা মদ
ছুই নে, গাঁজা-ভাঙের ছায়া মাড়াই নে, পান, তামাক, নশ্টি, আপিং,
বিড়ি, সিগ্রেট আমাদের ত্রিসীমানায় দেখতে পাবেন না, কিন্তু আমরা
প্রত্যেকটি ভোজালী জন্মাই রক্তে ধারের নেশা নিয়ে । ভোজালী বংশে

না জন্মালে আপনি এ নেশার ঘোঁক আন্দাজ করতে পারতেন না দাদা।

ধার নিয়ে ধার শোধ দেওয়া আমাদের কোনো পুঙ্কায়ের কৌশীতে লেখেনি। তেমনি ধার আদায় করবার অনাধার প্রতিলভাও আমাদের বংশগত। দেখলেন তো কি অনায়াসে আপনার কাছ থেকে আট আনা ধার নিলাম? অথচ আপনার সঙ্গে ক' মিনিটের পরিচয়? আমার বড় ছেলে পরমানন্দ ভোজালী হাজার পাঁচেক টাকা ধার কুড়িয়ে হুদে খাটাচ্ছে। একটি পাই পয়সাও শোধ দেবে না; তেমন বাপের ব্যাটাই নয় পরমানন্দ.....। হ্যাঁ, পাওনাদারেরা তাগিদ দিতে আসে বই' কি। কিন্তু রবি ঠাকুরের ঐ গানখানা শুনেছেন তো—‘সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে?’ পাওনার তাগিদ দিতে এসে পাওনাদারেরা লজ্জা পেয়ে ফিরে যায়, এমনি অমায়িক বিগলিত বচনের ভেলকিতে তাদের একেবারে জল করে ছেড়ে দেয় পরমানন্দ। এই যে অমায়িক বচনের বিগলিত ভেলকি, এই যে জল করে ছেড়ে দেওয়া, এও জানবেন ভোজালী বংশের বিশিষ্ট ধারা। এ জাহ্নু মিশে আছে প্রত্যেক ভোজালীর রক্তে। এই যে আপনি আট আনা ধার দিলেন, শোধ নেবার জন্তে তেড়ে এসে দেখুন একবার; এমন জল করে ছেড়ে দেবো আপনাকে, উল্টে আরো আট আনা দিয়ে যেতে ইচ্ছে করবে আপনার।

পরমানন্দ ভোজালীর বড় ছেলে গজানন ভোজালী বাপ্কা ব্যাটা, ঠাকুরদা নাতি। ভারী ধীরস্থির প্রকৃতির, ছটফটানি একদম নেই, ছ' বছর ধরে কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ছে, কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে প্রেক্সর আর বেয়ারা পর্যন্ত সবাই গজাননকে এক ডাকে চেনে। গজানন এখন দুশো সাতান্ন টাকা ধারে। ওর বয়সে ওর বাবা, মামে পরমানন্দ, আরো বেশি ধারত। পরমানন্দকে বলেছিলাম মন খারাপ করো না পরম। টাকার বাজার আগেকার চাইতে ঢের বেশি টাইট হয়ে গেছে, এইটে কুলে বোঝো না। তাছাড়া অ্যায়সা দিন বেছি রহুগা। মো' বাট শিওর উইল দি জেন। দেখবে এই

গজামনই একদিন আরের পাল্লায় ভোজ্য আমার হোক বামিরে দেবে ।
ভোজালী বংশের পবিত্র ধারা মার খাবে না গজাননের হাতে ।

এবারে আমার কথা বলি । আমার খার সর্বসাকুল্যে চার হাজার
তিনশো পঁচানব্বই । এ অবিশিষ্ট শুধু আসল, হুদ ধরিনি । শোধ
যখন করব না তখন আর হুদের হিসেব করা কেন ? আসল দেনা চার
হাজার তিনশো পঁচানব্বই, আর পাওনাদার সর্বসাকুল্যে তেতাল্লিশ জন ;
তা থেকে ছজন গজা পেয়েছেন, তাহলে ধরুন নীট একচল্লিশ জন ।
এদের অনেক বছর ভাঁড়িয়ে ভাঁড়িয়ে রেখেছিলাম, তারপর সতেরো জন
পাওনাদার ভারি ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলে, আর তাই দেখে
বাকি চব্বিশজনও ধরলে ঐ মহাজনী পন্থা । আমি তাদের বার বার
নানা কায়দার মিঠে কথা বলে ফেরাতে লাগলাম । কিন্তু ফেরালে হবে
কি ? তারা বার বার ফিরে গিয়ে আবার বার বার ফিরে ফিরে আসতে
লাগল, যেন সমুদ্রের নাছোড়বান্ধা ঢেউয়ের দল । ক্রমে ক্রমে আমি
ক্ষেপে উঠতে লাগলাম ।

হাজার হোক, মানুষের সইবার একটা সীমা আছে তো ? হলামই
বা ভোজালী । তাছাড়া, তাগিদ যত মিঠে, যত মোলায়েমই হোক
না কেন, তবু সে তাগিদ । সোনার চাবুকের মার কিছু সোনালী নয় ।
ওদের ভেতরে আবার সবচেয়ে জাহাঁবাজ শয়তান হলো গিয়ে হরিধন
পতিতুণ্ডি । মেয়ের বিয়ে, বোঁমার ব্যামো, বীমার প্রিমিয়াম, অমুকের
তমুক, তমুকের অমুক, হ্যানো-ত্যানো এক গাদা অভূহাত গুনিয়ে
গুনিয়ে কান কালা-পালা করতে লাগল, যেন আমার কাছ থেকে ঐ
একশো লাড়ে তিন টাকা পাচ্ছে না বলেই ওর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু
আটকে রয়েছে । শেষটায় জ্বালাতন হয়ে একবার ভাবলাম ছন্তোর,
দিই হরির কিছু টাকা শোধ করে । অমনি শিরায় শিরায় শিউরে
উঠে আমার ভোজালী রক্ত সিঁহনাজে বলে উঠল 'ধিক !' আর
হুকুমি ছাঁমিয়ারী দিয়ে বললে 'সর্বদাশ, একবার দুর্বলতা দেখালে

সবগুলো পাওনাদার এসে জোঁকের মত ঠেকে ধরবে, তখন সামলাতে পারবিনে।”

দিলাম না, একটি আখলা দিলাম না হরিধনকে। এক গাল মিষ্টি অমায়িক হাসি হেসে এক গাদা পালটা অজুহাত শুনিয়ে তাকে বিদেয় করলাম। আর একসঙ্গে রাম চটা চটে ঊঠলাম সবগুলো পাওনাদারের ওপর। হতভাগারা বোঝে না কেন একটি আখলাও আমার হাত দিয়ে গলবে না? আর তাই বুঝে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে না কেন? ওদের জ্বালায় কি বাকি জীবনটা একটু স্বস্তিতেও কাটাতে পারব না?

ওদের অপরাধে—বুঝলেন দাদা?—গোটা মানুষ জাতটার ওপরই ঘেন্না ধরে গেল। সেটা ভালো কথা নয় বুঝতে পারছি, কিন্তু হাজার হোক আমি মানুষ তো? গণ্ডার নই। জমা টাকা ভেঙ্গে তো আর ধার শুখতে পারিনে? কথায় বলে বসে খেলে আর ঘরের টাকা ভেঙ্গে ধার শুখলে রাজার ভাগুরও ফুরিয়ে যায়।

চটে-মটে সাতান্ন টাকা ধার করে এক শনিবার বিকেলে সোজা চলে গেলাম রেসের ময়দানে। তার আগে কালীঘাটে গিয়ে মাকে পেন্সাম করে বলে গেলাম ‘আজকের রেসের বাজীতে এক গাদা টাকা পাইয়ে দাও মা। চাঁদির জুতো মেরে পাওনাদারী মুখগুলো কিছুদিনের জন্তে বন্ধ করি।’

কিন্তু দাদা, ঐ করেই সর্বনাশ করলাম, মাকে চটিয়ে দিলাম। রেসের ময়দান থেকে ফিরলাম সাতান্ন টাকাই গচ্ছা দিয়ে। শুধু কি তাই? মাকে চটানোর জের অত সহজে মিটবার নয়। বাড়ি ফিরে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি বাড়ি নয়, হাসপাতালের বিছানা। মায়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ। কদিন পরে ব্যাণ্ডেজ খোলা হল তার হিসেব জানি নে। মনে হলো মগজের ভেতর যেন কি সব ওলট-পালট হয়ে গেছে, দিব্য চোখ আর দিব্য কান খুলে যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ যখন-

তখন। একদিন জন সাতেক পাওনার এলো দল বেঁধে আমায় দেখতে, বোধকরি ভয় পেয়েছিল আমি গঙ্গা পেয়ে ওদের পাওনা ঠকাব। তারা অমায়িক হেসে মুখে বললে ‘এখন কেমন আছেন ভোজালী মশাই?’ কিন্তু আমি পরিষ্কার জলের মতো শুনতে পেলাম, ওরা সব ক’টায় মনের ভেতর একসঙ্গে কোরাসে চৈঁচাচ্ছে :

‘শালা একটি আখলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।

‘শালা একটি আখলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।’

‘শালা একটি আখলাও শোধ না দিয়ে টেঁসবার মতলব আঁটছে।’

‘শালা.....’

আমি সব সইতে পারি দাদা, কিন্তু মুখের ওপর কেউ শালা গাল দিয়ে যাবে তা সইতে পারি নে। বার বার ওদের কোরাসের শালা শুনে ক্ষেপে উঠে একা অভিমত্বার মতো ঐ সপ্তরথীকে ছাতা পেটা করে তাড়ালাম। হাঁ-হাঁ করে আমাকে সামলাতে এসেছিল পরমানন্দ, তাকে দুই ধমকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দিলাম। ছোঁড়া মুখে কিছু বললে না, কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পেলাম মনে মনে বলছে ‘বুড়োর হাতে পায়ে ডাঙা বেড়ি লাগাতে হবে দেখছি।’ শুনে রেগে চিৎকার করে বললাম ‘তোরা বাপের সাখি কি আমায় ডাঙা বেড়ি পরাবে। নিকালো। আভি নিকালো হিয়ারসে।’ বাপের তিরিঙ্গি মেজাজ দেখে ভয়ে ভয়ে তখনকার মতো কেটে পড়ল পরমানন্দ। পাড়ায় পাড়ায় রটে গেল গাড়ির ধাক্কা খেয়ে মগজ নড়ে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভজগোবিন্দ ভোজালীর। দেখুন একবার কাণ্ড। দিব্যজ্ঞান খুলে যাওয়ার ঝকঝকিটা বিবেচনা করুন একবার।

অশান্তিও বাড়ল। বৌমাকে ভাবতাম আমাকে ঝগড় বলে একটু ভক্তিহেতু করে। এখন দিব্য কানে হঠাৎ একদিন শুনলাম সে মনে মনে বলছে ‘এবারে বুড়োটা গঙ্গা পেলে হাড়-জুড়োয়।’ বৌমা ক্ষেপে মাল্লু মস্কা হলে, মা কালীর দিব্য বলছি আপনাকে, সেদিন ওকে

ছাতা-পেটা করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম ।

কিন্তু—ঐ যে বোষ্টমর বললে—‘এই বাহ’ । আসল জ্বালায় কথা এইবার শুকুন । মানে—ঐ যে গোড়াতে বলেছিলাম—পূর্ব-পুরুষের উপা্য । শুরু হলো পিতৃদেবকে দিয়ে—মানে ১৭শে বৈশাখ ভোজালী । বাবা হাজির হলেন শনিবারের রাত্তিরে । খেয়ে দেয়ে বিছানা নেবার আগে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, তখন ।

বাবা বললেন ‘বাবা ভজগোবিন্দ, পরলোকে এসে অবধি একটি আধ্‌লা ধার করতে না পেরে নিদারুণ জ্বালায় জ্বলছি । আমার বাঁচাও এ জ্বালা থেকে ।’

আমি বললাম ‘কেন বাবা ? তোমাদের ওখানে কি ধার দেবার লোক নেই ?’

বাবা বললেন ‘আছে, কিন্তু ওপারের দেনা পুরো মেটানো না থাকলে এপারে একটি আধ্‌লাও ধার পাবার উপায় নেই । বড্ড কড়াকড়ি । তুমি ভোজালী বংশের ছেলে, বিনা ধারে থাকা যে কি চলেই-তাতো তোমার অজানা নয় বাবা । সুদে-আসলে আমার ঋণ এক হাজার তিনশো একান্ন টাকা আশী নয় পয়সা । এ ক’টা টাকা তুমি শোধ করে দাও, আমার এখানে ধার পাবার পথ পরিষ্কার হোক । বাঁচাও, বাঁচাও তুমি আমাকে, ধার না করে থাকার এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে ।’

বললে আপনি হয় তো বিশ্বাস করবেন না দাদা, পিতৃদেবের কথা শুনে আমি ব্যথিত, বিন্মিত, পুলকিত, চমকিত ছলাম । ভোজালীর রক্তে মেগা ধারের নেশা ওপারে গিয়েও বাণ্ডা নিচু করে না, তেমনি জোরালো থাকে !!!

বললাম ‘কিন্তু ধার শোধ করা কি ভোজালী বংশের পবিত্র ঐতিহ্যের বিরোধী হয়ে না-কাবা ? এ কলঙ্ক সাথার নিয়ে ভোজালী বংশের ঐক্য কলঙ্ক হতে বড়ই ভুগি আমাকে ?’

বাবা বললেন ‘তখন, পিতৃঋণ খোঁজে দেখে নেই, বিশেষ করে যখন

আমার যে পরিমাণ ঋণ তুমি শুধারে শোধ করবে, তার বেশি পরিমাণ ঋণ আমি এখানে গ্রহণ করে কোনো দিন শোধ দেবো না।’

আমি বললাম ‘কিন্তু ঘরের টাকা স্ত্রেতে পিতৃঋণ শোধ করাটাও কি উচিত হবে বাবা?’

বাবা বললেন ‘না। মহামতি চার্বাক বলে গেছেন ঋণ করে যি খেতে। তুমি ঋণ করে আমার ঋণ শোধ করতে পারবে না?’

‘কিন্তু তারপর আমার ঋণ?’

‘তোমার ঋণ যথাকালে শোধ করবে তোমার পুত্র পরমানন্দ। পরমানন্দের ঋণ শুধবে পরমানন্দের পুত্র গজানন। এইভাবে ভোজালী বংশে ধার শোধের ধারা বয়ে চলবে পুরুষাত্মকমে, পূর্ব-পুরুষ থেকে পরপুরুষে।’

বাবার অক্ষরোধ উপরোধ আর শাসানি শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারলাম না। এক হ্র্বল মুহূর্তে বলে ফেললাম ‘তোমার ঋণ শোধের ভার আমি গ্রহণ করলাম বাবা। কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে। মনে রেখো, রোম নগরী একদিনে নির্মিত হয় নাই।’

‘তুমি আমার ঋণভার গ্রহণ করলে, আমি নিশ্চিত হলাম বাবা ভজগোবিন্দ।’ বলে বাবা নিশ্চিত হয়ে চলে গেলেন। বাবাকে বচন দিয়ে যে কি বিষম বিষবৃক্ষ রোপণ করলাম, তখন তার আভাষ মাত্র টের পাইনি।

খানিকটা আভাষ পেলাম তার পরের শনিবার রাতে। সে রাতে আবির্ভাব হলো ঠাকুর্দা কৈলাস ভোজালীর। ঠাকুর্দা বললেন ‘বৎস ভজগোবিন্দ, তুমি পিতৃঋণ শোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ, এতে আমি খ্রীত হয়ে আশীর্বাদ করতে এসেছি।’

আমি বললাম ‘কল্পন।’

আশীর্বাদ করে ঠাকুর্দা তাঁর নিজের শোধ না করে ঋণগ্রহীতারের যে কিস্কিন্দি ছিলেন, স্ত্রে-আসনে তা মোটের ওপর ঠাকুর সন্তোষে শো

টাকা। ঠাকুর্দা বললেন ‘এ ঋণ তোমার বাবারই শোধ করে আসবার কথা ছিল। স্ত্রুতরাং এও তোমার পিতৃঋণ।’

প্রাণপণে এড়াতে চাইলাম, পারলাম না এড়াতে। ঠাকুর্দা বললেন ‘তোমার বাবা তো এই সেদিন এলো। আমি তার অনেক আগে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমার ওপারের ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত এপারে একটি আখলা ধার পাবো না আমি। এ যন্ত্রণা থেকে আমায় বাঁচিয়ে উপযুক্ত নাতির কাজ করো ভক্তগোবিন্দ। যজ্ঞেশ্বর তোমার বাবা। আমি তোমার বাবার বাবা। বাবার জন্তে বাবার বাবাকে ভুললে চলবে না। সাবধান, ভক্তগোবিন্দ।’

ধমকানিতে স্বাবড়েই বলুন, সমব্যথায় গলেই বলুন, অথবা কর্তব্যের ধাক্কা খেয়েই বলুন, ভেবে দেখলাম সত্যিই বাবার চাইতে বেশি দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। কথা দিলাম বাবার ঋণ শুধলে সেই সঙ্গে ঠাকুর্দার ঋণও শুধে দেবো।

তখনো টের পাইনি কি সর্বনাশের চোরাবালিতে পা দিলাম। এর পরের শনিবার মাঝ রাতে এক বুড়ো এসে হাজির আমার একলা ঘরে।

শুধালেম ‘কে আপনি?’

‘আমি তোমার ঠাকুর্দার বাবা রামকানাই ভোজালী।’

বুঝলাম ইনিও এর ইহলোকের ঋণের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাতে এসেছেন। বললাম, ‘তার প্রমাণ? আমি আপনাকে দেখিনি, আপনার ছবিও নয়।’

‘রামকানাই ভোজালী হাঁকলেন ‘কৈলস!’

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজীর মতো কোথা থেকে এসে হাজির ঠাকুর্দা! কৈলাস ভোজালী। রামকানাই বললেন ‘আমি তোর বাপ কিনা?’ ঠাকুর্দা বললেন ‘আজ্ঞে।’

ঠাকুর্দার বাবা আবার হাঁকলেন ‘যজ্ঞেশ্বর কোথা গেলি রে? জগু?’

সঙ্গে সঙ্গে আমার বাবা, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর ওরফে জগু এসে হাজির ।

রামকানাই ভোজালী বললেন ‘আমি তোর কে হই ?’

বাবা বললেন ‘আজ্ঞে, ঠাকুর্দা ।’

‘এবার তোমরা চলে যেতে পারো ।’ বললেন ঠাকুর্দার বাবা । চলে গিয়ে যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন ঠাকুর্দা আর বাবা । ঠাকুর্দার বাবা বললেন ‘তোমার ঠাকুর্দা যদিই বেঁচে ছিল, ভেবেছিলাম আমার ধারগুলো সব শুধে আসবে । একটি আখলাও সে শুধে এলো না । ওদিকে চক্রবৃদ্ধি স্তূদে আমার দেনা বাড়ছে, এদিকে সেই সঙ্গে আমার যন্ত্রণাও বাড়ছে, চক্রবৃদ্ধি হারে গ্যালপিং থাইসিসের মতো । ওপারের দেনা স্তূদে-আসলে শোধ না হওয়া পর্যন্ত এপারে একটি আখলা ধার মিলবে না । ও-ও-ও-ও-ওফ্ !!!’ বলে এমন মর্মভেদী আর্তনাদ করলেন আমার ঠাকুর্দার বাবা, যে মনে হলো তার ধাক্কা আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেল ।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার বাবার ঋণের দায়টাও নিতে হলো । ওঁর ঋণ চক্রবৃদ্ধি স্তূদে বেড়ে তখন হয়েছে আড়াই হাজার টাকা । মূল পাওনাদারেরা তখন, আর ইহলোকে নেই, তাদের বর্তমান বংশধরদের নাম ঠিকানা আর আলাদা পাওনার হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন রামকানাই ভোজালী । পুরো তিন পুরুষের ঋণের বোঝা মাথায় চাপল স্তূদে-আসলে । তারপর পুরো এক হপ্তা ভয়ে ভয়ে কাটালাম । শনিবারটা যতই এগিয়ে আসে ততই শিউরে উঠি । তবু শনিবার এলো । এলো রাত্তির । এবারে যিনি এলেন তাঁর বয়স ঠাকুর্দার বাবার চাইতে অনেক কম মনে হল । তিনি বললেন, ‘আমি হচ্ছি দিগম্বর ভোজালী, রামকানাইর বাবা, তোমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা । তুমি হলে আমার নাতির নাতি । রামকানাইর চাইতে আমি অনেক কম বয়সে মারা গিয়েছিলাম, তাই আমার চেহারা রামকানাইর চাইতে কাঁচা দেখেছ । প্রমাণ চাও তো বলো রামকানাইকে ডাকি ।’

‘আমি বললাম ‘করকার নেই।’ ঠাকুরদার ঠাকুর।’ এমন হিপনোটাইজ করে আমার ঘাড়ের চাপিয়ে থেলেন তাঁর হৃদে আসলে লাড়ে তিন হাজার টাকা ঋণের বোঝা, আর পাণ্ডনাদারদের সর্বশেষ বংশধরদের কর্দ।

পরের শনিবার এলেন দিগম্বর ভোজালীর বাবা পীতাম্বর ভোজালী। তারপরের শনিবার পীতাম্বর ভোজালীর বাবা ব্যোমকেশ ভোজালী। তারপরের শনিবার ব্যোমকেশ ভোজালীর বাবা জগবন্ধু ভোজালী। পুরুষের পর পুরুষের চক্র-বাড়তি ঋণের বোঝা হস্তার পর হস্তা চাপতে লাগল আমার ওপর। শেষে আমার কাণ্ড দেখে অনেক হাঙ্গামা হুজুং করে এখানে পাঠিয়ে দিলে পরমানন্দ, আমার বড় ছেলে।

আমার ইহলোকের একচল্লিশজন পাণ্ডনাদার হাল ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তারা আর এখান পর্যন্ত থাকে না। কিন্তু আমার পরলোকের পূর্বপুরুষদের হামলা বেড়েই চলেছে দাদা। তাঁরা যেখানে কখন খুশি অনায়াসে যেতে পারেন, একটি আখলা খরচ নেই। কি শনিবারে এক পুরুষ আগেকার পূর্বপুরুষ এসে তাঁর ঋণের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছেন আমার ওপর। গেল শনিবারে যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম মকরধ্বজ ভোজালী। আমি হচ্ছি তাঁর নাতি। পঁয়তাল্লিশ পুরুষের চক্রবৃদ্ধি ঋণের বোঝা চেপেছে আমার ঘাড়—সে যে হিসেব করলে কত লাখ টাকায় দাঁড়াবে তা বলা শক্ত।

আমার হাতে লেখা রয়েছে আমি আরো দশ বছর বাঁচব—আরো পাঁচ শো কুড়ি হস্তা। এই পাঁচ শো কুড়ি হস্তায় আরো পাঁচ শো কুড়ি পুরুষের চক্রবৃদ্ধি ঋণের বোঝা আমার ঘাড়ের চাপবে। কি সাময়িক ব্যাংকার তেবে দেখুন একবার। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত সবই আমি চমকিয়ে আর পরমানন্দের ঘাড়ের, পরমানন্দ

কল্পকালে চাপাবে সন্ধ্যার ঘাড়ে, এতদিন করে প্রত্যেক পুরুষ
 কোথা চাপাবে তার পক্ষ পুরুষের ঘাড়ে। কিন্তু, যদিও চাপাবে না
 পাল্লাই, তবুদিনের এই দশ বছর যে কি ছুটোগ আমার সহিতে হবে
 তা আর কহতব্য নয় দাদা। ফি শনিবারের রাতে পূর্ব-পুরুষদের
 দল বেঁধে জগিদে জ্বালাতন সহিতে হবে আমাকে। হস্তার পর
 হস্তা দিয়ে যেতে হবে ভূয়ো কৈকিয়ন্তের পর ভূয়ো কৈকিয়ৎ, কেন
 তাঁদের ধারের একটি আখলাও শোধ হচ্ছে না। এ অত্যাচারে
 আর কতদিন মাথা ঠিক রাখতে পারব জানিনে। আসছে বছর
 যদি এ সময় আবার বেড়াতে আসেন, হয় তো দেখবেন আমি সত্যি
 সত্যি পাগল হয়ে গেছি। যাবার আগে আমার শেষ বাপীটুকু শুনে
 যান : সাবধান, তুলেও কোনোদিন ভোজালী বংশে জন্মাবেন না।

প্রেম, পাগলামি আর কবিতা—এই তিনটির মধ্যে একটি যোগসূত্র
 আছে, এবং সেই যোগসূত্রটি হচ্ছে কল্পনা, এই তবুটি ডাক্তার ত্রিপাঠী
 ধার করেছিলেন শেক্সপীয়ারের কাছ থেকে। সেই থেকেই তিনি
 এই বিশ্বাসটি মনে মনে খাড়া করে নিয়েছিলেন যে প্রত্যেক কবিই
 কিছু পরিমাণে পাগল, এবং প্রত্যেক পাগলই কিছু পরিমাণে কবি।
 অর্থাৎ যে কোনো কবিকেই ঠিকমতো আস্কারা দিয়ে যেতে পারলে
 তাকে শেষ পর্যন্ত পাগলা-গারদে ভর্তি করবার লায়েক করে নেওয়া
 যায়, এবং প্রত্যেক পাগলের ভেতরকার স্তম্ভ কবিটিকে কায়দা করে
 একবার তাতিয়ে তুলতে পারলেই.....ইত্যাদি।

ভবভূতি ভঞ্জ-র ভেতরকার স্তম্ভ কবিটিকে ডাক্তার ত্রিপাঠী কি
 কোশলে জাগিয়ে তুলেছেন জানবার চেষ্টা করি নি। শুধু জেনেছি
 তিনি শকুন্তলা স্মৃতিসৌরভের সত্যকবি—শোয়েট লরিয়েট। কবিতার
 ভাবকর, ভাষা, আজিক ইত্যাদি নিয়ে বেশরোজ্য কান্নারকর পরীক্ষা

নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, যাকে বলে এক্সপেরিমেন্ট। কিন্তু কবিতা লিখবার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো বাঁধানো খাতা নেই। তিনি এলোমেলো টুকরো কাগজে কবিতা লিখে লিখে ঝুড়িতে ঝুলিয়ে রাখেন, বলেন “বাঁধানো খাতার বন্ধনের ভেতর আমার কবিতা ফুটবে না।”

“ভবভূতি ভঞ্জ-র কবিতার এই হচ্ছে আশ্চর্য মজা” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী, “ওর যে কবিতার কোনো মানে নেই মনে হয় সে কবিতাতেই লুকিয়ে থাকে সব চেয়ে বেশী মানে; আর যে কবিতা মনে হয় মানে-তে ভরপুর, সে কবিতার আসলে কোনো মানে নেই। এই হচ্ছে আমাদের কবি ভবভূতির ডায়ালেক্টিক্‌। যেমন ধরো...”

বলে ভবভূতির একটি কবিতা থেকে আবৃত্তি করলেন তিনি :

“আমি ভবভূতি ভঞ্জ ।

বাস ছিল মোর ময়ূরভঞ্জে,

সেইখানে পড়ে রয়েছে মন যে,

সুম-চোখে দেখি : আরে, আরে একি,

এ কোন্‌ নূতন গঞ্জ ?

ডন-কুইজোট্‌ কোথা গেল মোর ?

আমি যে স্তাংকো পাঞ্জা !

মিছে কলিকায় কেন ভরি হায় গাঞ্জা ?

আঙিনায় মোর সোনার খাঁচায়

বিমনা যে পাখী পুচ্ছ নাচায়

একটি চাপড়ে দিয়েছিহু করে

তারি এক ঠ্যাং খঞ্জ—

আমি ভবভূতি ভঞ্জ ।”

“কি মনে হয় এ কবিতা শুনে ?” প্রশ্ন করলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। বললাম “মনে হয় গভীর অর্থযুক্ত কবিতা।”

“ভুল করছ ধনপতি।” হেসে বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। “একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে এ কবিতার কোনো মানে নেই।”

একটু ভেবে দেখে বললাম “হ্যাঁ, একদম মানে নেই বলেই মনে হচ্ছে যেন।”

বিজয়গর্বে বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের চাপড় মেরে ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন “অথচ মানে-তে ভরপুর। রূপক আর প্রতীক একসঙ্গে এমন পাকা হাতে গুলেছে ভবভূতি, যে একে মিরাকল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কবিতাটি একটি হৃদাস্ত স্মার্টায়ার, বিংশ শতাব্দীর গালে মেরেছে একটি প্রচণ্ড চাপড়, অথচ এমন আশ্চর্য সূক্ষ্মভাবে যে বিংশ শতাব্দীর বাবারও সাধ্য নেই টের পাবার। এ যে ফুল ফোটাতে, না ছল ফোটাতে, এ বুঝতে বুঝতে বিংশ শতাব্দী কেটে যাবে।”

“আশ্চর্য !!” বললাম আমি।

“মিরাকল!” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। “আমি তো বলি ভবভূতি ভুল করে এদেশে জন্ম নিয়ে ফেলেছে, নেবার আগে খেয়াল করেনি। ওর জন্মানো উচিত ছিল এজরা পাউণ্ড আর টি এস্ এলিঅটের দেশে। ওর আরেকটা কবিতা শোনো।”

বলে শোনালেন :

“তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিছ
কাল চব্বিশে ফাগুন
হাউই বাজীর আগুনী হোঁয়ায়
আকাশে লেগেছে আগুন
চাঁদে সে আগুন লেগে দেখি ভাই
কলংক তার পুড়ে হলো ছাই
তারারা চৈঁচায় ‘পুড়ে মারা যাই
জাগুন জলদি জাগুন।’

সহস্র মেঘের দমকল এসো।

ইঁক ছোড়ে গুরু গুরু ;

বর বর বর বরষণ হলো গুরু ।

সে হুরে আগুন নিভিল তারার

চাঁদ ফিরে পেল কলংক তার

সেই হুর ধরে জেগে দেখি ভোরে

আজকে পঁচিশে ফাগুন ।”

শুধালেন “কি মনে হয় ?”

বললাম “মনে হয় কোনো মানে হয় না এ কবিতার ।”

আবার হাসলেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী । বললেন “ভুল করলে ধনপতি । মনে হয় এ কবিতা গভীর ইঙ্গিতে, রূপকে, প্রতীকে, ব্যঙ্গনায়, তত্ত্ব ভরা । একে ফাগুন, বসন্তের সখা, তার চব্বিশ তারিখ । তার ওপর আকাশে আগুন লাগা, চাঁদের কলঙ্ক পুড়ে যাওয়া, মেঘের দমকল, এসব তো রীতিমত গভীর ব্যাপার বলে মনে হয় । মনে হয় এ এক মহা ভাবপূর্ণ মিস্টিক কবিতা ।”

ভেবে বললাম “তা বটে ।”

ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন “কিন্তু না । প্রতীক ক্রতীক এতে কিছু নেই, কোনো মানে নেই এ কবিতার । ফাগুন দেখে ভাবছ বসন্তের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছে কবি, কিন্তু তা নয় । মাসটা বোশেখ কি চোত-ও হতে পারত, ফাগুন বসিয়েছে শুধু আগুনের সঙ্গে মেলাবার জন্তে । আর ঐ যে চাঁদের কলঙ্ক পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে চাঁদের আবার কলঙ্ক ফিরে পাওয়া, ও-তো আর কবিতা নয়—ও হলো পি. সি. সরকারের ম্যাজিক ।”

আমি বললাম “আশ্চর্য ! এভাবে আমি তো ভাবতেই পারিনি ।”

“অনেকেই পারে না । এই যে, শেঠজীর কুচিরে পৌছে গেলাম । এসো ধনপতি ।” বললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী । চুকে গেলাম শেঠজীর ঘরে । দেখলাম ফরাসের ওপর বসে আছেন শেঠ কিরণলাল । তাঁর

মুখোমুখি বসে আছেন কবি ভবভূতি আর বাংলার গৌরব প্রফেসর ট্যালপেট্রো ।

“আইয়ে ডাক্তারজী, আনুন ধনপতিবাবু । ছ’চার কবিতা শুনাচ্ছি গুরুজীকে ।” বললেন শেঠজী, কবি ভবভূতির দিকে ডান হাত ছলিয়ে দিয়ে । বুলাম কবি ভবভূতিকে কবিতা লেখার গুরু বানিয়েছেন শেঠ কিশোরলাল ভরদ্বাজ ।

“আরে রাম রাম, কি যে বলেন শেঠজী !” বললেন কবি ভবভূতি । “আমি হবো আপনার গুরু ? কবিতা কি আর গান, যে তালিম দিয়ে শেখানো যাবে ?”

ডাক্তার ত্রিপাঠীর কাছ থেকে শেখা কথা আউড়ে শেঠজীকে বুলাম “আপনার ভেতরেই যে কবি ছিল সে জেগে উঠেছে মাত্র ।”

“হাঁ, সে তো জরুর । কিন্তু জাগাইয়েছেন ভবভূতিবাবু ।” বললেন শেঠ কিশোরলাল ।

“আপনি কবিতা পড়ুন, শেঠজী ।” বললেন কবি ভবভূতি ।

“আমার প্রথম কবিতা আছে সমুদ্রের উপর—পুরীর সমুদ্র ।” বলে পুরীর সমুদ্রের ওপর লেখা স্বরচিত কবিতা গুরু করলেন শেঠজী :

“তুমহার তটপর বৈঠে, হে সমুদ্র !

হে ভয়ংকর ঔর হে সুন্দর !

গিন্টি করি তুমহার ঢেউ ’পর ঢেউ,

আগে বাঘ ঔর পিছে ফেউ ।

তুমহার জলমে, হে জলরাজ,

ডুবে নাও ঔর ডুবে জাহাজ,

আদমি ডুবে, ডুবে মাল,

লঙর ডুবে, ডুবে হাল,

তব্ ভি ডর না করে প্রাণ—

বীমা কম্পানী ভরে লোকসান ।”

জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সব মাল সমুদ্রে ডুবে গেলেও ভয়ের কারণ
নেই, কারণ লোকসান যা হবে বীমা কোম্পানীই তা পূরণ করে দেবে।

শেঠজী পড়ে চললেন :

“হে মহাসাগর, হে গম্ভীর !
বহুৎ হাজার ঠর বহুৎ কুস্তীর,
বহুৎ তিমি ঠর তমিংগেল
তুমহার জলমে করে খেলু,
খেলে মাছ হাজারো হাজার
য্যায়সা শেয়ার ঠর ফটকা বাজার।”

আশ্চর্য কল্লনাশক্তি শেঠজীর। সমুদ্রে থেকে একেবারে শেয়ার
মার্কেট ! আমাদের অন্তর থেকে উৎসারিত হল সমবেত বাহবাধ্বনি।
শেঠজী পড়লেন :

“তুমহার জল ’পর চলে লড়াই,
সাথে সাথ বাজার চড়াই,
শও-এর মাল বিকে হাজার,
কহে মূরখ কালা বাজার।
কমে মাল ঠর বঢ়ে ভাও,
মিলে মওকা, মারি দাঁও।
জয় সাগর, জয় নিমক-জল,
করে বন্দন নন্দনমল।”

যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আর কালোবাজারের
উৎপত্তির তত্ত্ব কবিতায় অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলেছেন শেঠজী। কিন্তু
‘নন্দনমল’ কেন ? নন্দনমল ছিল শেঠ কিশোরলালের ছেলেবেলার নাম।
কবিতার জগতে এই নামটিই গ্রহণ করেছেন তিনি।

“আপ্কা ইয়ে কবিতা অপূর্ব, অনবজ্ঞ হ্যায়।” বললেন প্রফেসর
ট্যালপেট্রো।

কবি ভবভূতি বললেন “এর চেয়ে আরো অপূর্ব, আরো অনবদ্য
‘শেয়ার বাজারে পাপিয়া’ কবিতাখানা পড়ে শোনান তো শেঠজী।”

শেঠজী পড়ে শোনালেন :

“বেলা হুপহর, রোদ ঝম্ ঝম্, ভিড়-জমাট শেয়ার-বাজার।
বাজার ভাও উঠে, বাজার ভাও নামে; যেমন দরিয়ার ঢেউ।
লাখে লাখ, কড়োর কড়োর রুপैया করে হাথ-বদল,

হল্লা ভরপুর শেয়ার-বাজার।

হঠাৎ কোন্ পপैया কোন্ ছাতে কোন্ কুঠরিতে
প্রশ্ন পুছে : পিউ কাঁহা ? পিউ কাঁহা ? পিউ কাঁহা ?
শেয়ার-বাজারী হল্লায় পপৈয়ার ডাক ডুব খায় :
কুহু কুহু ! কাঁহা কাঁহা ? কাঁহা পিউ ? পিউ কাঁহা ?
জবাব নাহি। কে দিবে জবাব ? ফির কহে : পিউ কাঁহা ?

জুট, হেশিয়ান, গানি, লোহা, ইস্তীল, আলমুনিআম,
ফটকা চলে বাহার হাজারো হাজার, লাখে লাখ,
আর ভিতর চলে হল্লা লাখে লাখ, কড়োর কড়োর।

লোনা ঢেউ শেয়ার-সমুন্দর, ডুবে ভাসে হাজারো নাও,
মধু ঢেউ ঢালে পপैया, অরে মুখ, জলদি শোন
ভোল শেয়ার-ভাও, ফটকা বাজার, ঐ সুরে সুর মিলা :
পিউ কাঁহা ? পিউ কাঁহা ? কাঁহা পিউ ? পিউ কাঁহা ?”

শুনে আমি মুগ্ধ। আবেশে চোখ মিটি মিটি করে প্রফেসর
ট্যাল্পেট্রো বলতে লাগলেন “পিউ কাঁহা ? পিউ কাঁহা ? হায় হায়
হায়, কানমে অমৃত ঝরা দিয়া শেঠজী ! শেয়ার-মার্কেটকা তামাম
গোলমালকো ছাপাকে পাপিয়াকা দিল-দুলানা যাহুভরা সুর ধ্বনিত হো

উঠা : পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা ! অনবচ্ছিন্ন কবিতা হয়, শেঠজি !”

শেঠজী বললেন “কবিতা আস্‌মান, ঔর ক্রপৈয়া জমিন । রাবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন—কি বলিয়েছেন সে তো আপনারা জরুর জানেন, আমি আর নূতন কি শুনাবো ?”

আমি বললাম “আশ্চর্য আপনার কবিতা, শেঠজি ! অনেক দিন মনে থাকবে ।”

শেঠজী বললেন “আপনার মেহেরবাণী, আর গুরুজীকী কৃপা ।”

ধন্য কবি ভবভূতি ভঞ্জ, যদি তিনি শেঠ কিশোরলালের ভেতরকার হৃদয় কবিকে এমন করে জাগিয়ে থাকেন ।

“আমার জীবনের একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী তোমায় শুনিয়েছি, ধনপতি, যার নায়িকা তিলোত্তমা ।” বললেন ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী । “কিন্তু একটি কাহিনী তোমায় শোনানো হয়নি, যা আরো মর্মাস্তিক । সে কাহিনী চিরদিন গোপন রাখব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার কাছ থেকে কিছু গোপন রাখতে চাইনে । শোনো ।”

কাহিনী শোনালেন ডাক্তার ত্রিপাঠী । যেমনটি গুনলাম ঠিক তেমনটি, ছবছ তারই জবানীতে লিখে রাখছি আমার ডায়েরিতে!.....

কলকাতার উত্তর সীমান্ত থেকে মাইল বারো দূরে এক নিরালা বাগানবাড়িতে সূর্যকান্ত বরাটের শোবার ঘরে একটি স্বচ্ছ, পুরু কাঁচের চৌবাচ্চা । নামটা জমিদারোচিত হলেও, সূর্যকান্ত বরাট জমিদার নন, শুধু বিরাট বড়লোক ।

আমাকে তিনি মাছ দেখাচ্ছিলেন চৌবাচ্চার জলে । মস্ত চৌবাচ্চায়, আঙ্গুলের মতো ছোট, রামধনুর মতো রঙিন একটিমাত্র মাছ ।

তার মুহূর্ত, অতিমুহূর্ত গতিবিধি মুহূর্তোখে দেখতে দেখতে সূর্যকাস্ত বললেন
“এমন আশ্চর্য মাছ আর কখনো দেখেছো ডাক্তার ?”

সে-প্রশ্নের একটিমাত্র সহৃদয় জবাব হতে পারে। বললাম
“আজ্ঞে না।”

সূর্যকাস্ত বললেন “দেখা সম্ভবও নয়। হনলুলু থেকে সোজা
চৌবাচ্চাতেই ছুটি এসেছিল, একটি এই চৌবাচ্চাতেই শেষ নিশ্বাস
ত্যাগ করে চলে গেছে। রঙিন মাছ মারা গেলে তার আত্মা কোথায়
যায় বলতে পারো ডাক্তার ?”

ডাক্তারী শাস্ত্রে এ-তত্ত্ব লেখা নেই। বললাম “আজ্ঞে না।”

সূর্যকাস্ত বললেন “আমিও পারিনে। কিন্তু আমার মনে হয়
এই মাছটি এখনো তাকে ভুলতে পারেনি। দেখেছো তো ছুটি চোখে
কী বিষম দৃষ্টি ? ওর বিরহ-ব্যথার হাহাকার আমি যেন কানে শুনতে
পাই, ডাক্তার।”

বললাম “আহা বিরহী বেচারা !”

“বিরহী কি বিরহিনী সেইটেই রহস্য, ডাক্তার।” বললেন
সূর্যকাস্ত। “মাছের মনস্তত্ত্ব যদি-বা খানিক বুঝি, দেহতত্ত্ব একেবারে
নয়।”

“তাহলে একজন মাছ-বিশেষজ্ঞ আনিয়ে বরং—”

“না, ডাক্তার। এসেছিল মৎস্ত-দম্পতি, একজন চলে গেল।
নাই-বা জানলাম বাকী রইল রহস্যময়, না রহস্যময়ী।”

রঙিন মাছটির মুখ থেকে জলের কয়েকটি বুদ্ধবুদ্ধ ওপর দিকে উঠে
গেল। মুহূর্ত একটি দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো সূর্যকাস্ত বরাটের বিরানট
বুকের ভেতর থেকে। “পড়তি বয়সে সাথীহারার দিনরাত জুড়ে
কী যে মক্ক-সাহারার হাহাকার, তা তুমি বুঝবে না, ডাক্তার।” বললেন
তিনি। “কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিধে দংশেনি
যারে ?” বলে তাকালেন ওপাশের দেয়ালের গায়ে ঝোলান তাঁর স্বর্গীয়

পয়ীর অয়েল-পেণ্টিং-এর দিকে । তলায় লেখা রয়েছে জন্ম-তারিখ
আর মৃত্যু-তারিখ ।

বললাম “বারো বছর হলো আপনার জীব-বিয়োগ ঘটেছে ?”

“সওয়া বারো বছর ।” বললেন সূর্যকান্ত । “তার বছ আগে
থেকেই ছেলেটাকে মানুষ করছে বিনোদিনী । বিনোদিনীকে না
পেলে কী হতো জানিনি, ডাক্তার ।”

“বিনোদিনী কে ?” মুখ থেকে হঠাৎ ফস্কে গেল কৌতূহলী
প্রশ্ন । চিন্তিত হলাম । অতি কৌতূহল যেন প্রকাশ করে না
ফেলি কখনো সাবধান করে দিয়েছিলেন ভুবনকাকা ।

সূর্যকান্ত বললেন “ঐ যে বললাম, নবকান্তকে যে মানুষ করেছে ।
এই নবকান্তই তোমার এক নম্বর পেশেন্ট । আমি হলাম হু’নম্বর ।
আর বোমাকেও হয়তো মাঝে মাঝে একটু...সে তুমি ধীরে ধীরে
সবই জানতে পারবে ডাক্তার, ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান হলে যখন ।”

বললাম “আপনার ছেলেকে এখনো দেখিনি । বোমাকেও নয় ।”

সূর্যকান্ত বললেন “নবকান্ত এখন স্টুডিওতে ছবি আঁকছে ।
বোমাও আছে সেখানেই ।”

“আপনার ছেলে আর্টিস্ট ?”

“আর্টিস্ট । অসাধারণ আর্টিস্ট । ও একটা বিরাট জিনিয়াস ।”
বললেন সূর্যকান্ত । “মাঝে মাঝে ঐ জিনিয়াসের প্রচণ্ড ধাক্কা ওর
দুর্বল ক্রীণ দেহে ও সহিতে পারে না । কখনো ফ্লেপে ওঠে, কখনো
অসার হয়ে যায়, কখনো-বা—সে তুমি নিজেই দেখে নিয়ো, ডাক্তার ।
ওসব লক্ষণের অনেক ল্যাটিন নাম-টাম হয়তো তোমাদের ডাক্তারি-
শাস্ত্রে আছে । আমার মনের উদ্দাম ক্যাপামি রক্তের ধারায় পেয়েছে
নবকান্ত, কিন্তু ঐ-যে বলেছি, দেহটা ওর বড় দুর্বল, আমার মতো
পোক্ত নয় । তুমি দেহের ডাক্তারিতে হাত পাকিয়েছ বটে, তবু
মনের ডাক্তারিও জানো জেনেছি । তাই তোমাকেই ডেকে এনেছি

বলার্ট-বাড়ির ক্যামিলি-কিজিশিয়ান হতে।”

“কার কাছে গুনলেন আমি মনের ডাক্তারিও জানি?”

“তোমার ভুবনকাকার কাছে। ভুবনবাবু তোমার বাবার কিরকম ভাই হে, ডাক্তার?”

“আজ্ঞে, ভাই নন, বালাবন্ধু।”

“তাহলে তো আরো ভালো, ডাক্তার। রক্তের সম্পর্কের চাইতে পাতানো সম্পর্ক ঢের বেশী রোমাঞ্চিক। জানো কি না জানিনে, আমি আমার বাবার পাতানো ছেলে। আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি জন্ম ছাড়া আর কিছু দেননি। পাতানো বাবা আমাকে দিলেন তাঁর পদবি, আর যাবার আগে দিয়ে গেলেন তাঁর প্রচুর টাকা। চলে যাবার আগে স্বামী বানিয়ে রেখে গেলেন আমাকে; ঐ ষাঁর ছবি দেখতে পাচ্ছ তাঁর। এইবারে একটু আত্মনিন্দা করব, ডাক্তার।”

“করুন।”

“তোমরা যাকে বাংলায় লম্পট বোলে, আর ইংরেজিতে স্কাউন্ড্রেল, বছরের পর বছর আমি ছিলাম ঠিক তাই। কিন্তু দোষ আমার নয়, ডাক্তার—দোষ আমার রক্তের। আর দোষ আমার ভাগ্যবিধাতার; তিনি বড় কমবয়সে আদর করে আমার হাতে বড় বেশী টাকা দিয়েছিলেন। পাতানো বাবার টাকা পাবার পর আরো অনেক টাকা পেলাম বিধবা এক পাতানো মাসীর; মস্ত বড়লোক স্বামীর নিঃসন্তান উত্তরাধিকারিণী দেখে ষাঁকে মাসী বলে ডেকেছিলাম। স্ত্রী রইলেন ঘরের এক কোণে ভুলে যাওয়া আসবাবের মতো, আর আমি মেতে রইলাম বাইরে বাইরে জীবন কাটাবার অ্যাডভেঞ্চারে। আমার সেই কয়েক বছরের লম্পটের কাটালগ শুনে তুমি আর এখন কি করবে ডাক্তার? নাই বা স্টাটলাম ওসব পুরোনো কান্ডলি। শুধু বলি, শেষটায় অবসাদ এলো দেহে মনে। একদিন মাঝরাতে চিত হয়ে শুয়ে

শুনছিলাম দূর থেকে ভেসে আসা গান। সে গান হঠাৎ একবার
থেমে গেল। সব গানই তো কখনো না কখনো থেমে যায়। কিন্তু
তখন কি আমার মনে হলো জানো ডাক্তার ?”

“জানিনে।”

“মনে হলো একদিন হঠাৎ আমিও থেমে যাবো, মিলিয়ে যাবো
চিররাত্রির অসীম শূন্যতায়। হঠাৎ বৃকের ভেতরটা কাঁকা কাঁকা
লাগতে লাগল, মনে হলো যেন দম বন্ধ হয়ে আসবে। সে ছুঃসহ
অস্বস্তি তুমি বুঝতে পারবে না ডাক্তার, যদি না বৃকের ভেতরে
কোনোদিন তেমনি শূন্যতা অনুভব করে থাকো।”

“তারপর ?”

“বাইরে থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম ঘরের দিকে।
চাইলাম সন্তান, চাইলাম বংশধর—যার ভেতর আমি বেঁচে থাকব,
মৃত্যুর পর ফিরিয়ে যাবো না। তারপর ? যে-বয়সে কেউ কেউ
পিতামহ হয়, সে-বয়সে আমি প্রথম পিতা ছলাম। সেই আমার
প্রথম, আর সেই আমার শেষ পিতৃত্ব।”

মনে হলো বড় রকমের দায়িত্ব চাপছে আমার ডাক্তারি ষাড়ে।
যে-নবকান্তুর মধ্যে বেঁচে থাকতে চান সূর্যকান্ত, সেই অসাধারণ
প্রতিভাধর নবকান্তকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাকে।

“হ্যাঁ, কি বলছিলাম ?” বলতে লাগলেন সূর্যকান্ত। “সেই
আমার শেষ পিতৃত্ব। নবকান্তকে পৃথিবীর আলোয় আনবার ক্ষেত্রে তার
মা’র শীর্ণ দুর্বল দেহের ওপর দিয়ে যে মহাপ্রাণয়ের ঝড় বয়ে গেল,
জাতে সে-যাত্রা তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু বাকী জীবনের
মতো তাঁকে ইন্ড্যালিড হতে হলো। রইল না আর মাতৃস্বের
সম্ভাবনা। আর প্রয়োজনও ছিল না ডাক্তার, কারণ বেঁচে গেল আমার
বংশধর নবকান্ত। আর ঠিক সেই সময়—মেজাজ ভালো থাকলে
বিধাতা কী চমৎকার যোগাযোগ ঘটাতে পারেন ভেবে জ্বাখো, ডাক্তার—

বিধবা হলো বিনোদিনী। বিনোদিনীর উড়নচণ্ডী স্বামী শুধু জীবন নিয়েই খুশী ছিল, জীবনবীমার প্রয়োজন বোধ করেনি, রেখে যায়নি কোনো সঞ্চয়। চলে যেতে চায়নি ভবকিশোর। জীবনকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল। বিনোদিনীর মতো সঙ্গিনীর সঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে চাওয়া সহজে কোনো পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু যম যখন নিয়ে যাবে বলে কোমর বাঁধে, তখন কোনো ডাক্তারের বাবাও তাকে আটকাতে পারে না।”

আমি হেসে বললাম “তাহলে আর ডাক্তার ডাকা কেন?”

“যম তো সব সময় কোমর বাঁধে না, ডাক্তার।” বললেন সূর্যকান্ত বরাট। “মাঝে মাঝে সে শুধু একটু ভয় দেখাতে দূত পাঠায়।”

এমন সময় দরজার ঠিক বাইরে থেকে মেয়েলী কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, “আসব?”

“এসো, বিলু।” বললেন সূর্যকান্ত বরাট। এলেন বিনোদিনী। সরু কালোপাড়ের ধুতি তাঁর দেহ ঘিরে শাড়ির রূপ নিয়েছে। পায়ে নাগরাই। পিঠ-ছাওয়া প্রচুর এলো চুলে ঈষৎ ধূসরতার আভাস। বয়স বোধকরি শ্রৌতব্রতের কাছাকাছি, যৌবন তবু যেন মায়া কাটিয়ে চলে যেতে চাইছে না ঐ দেহ থেকে।

হাতে ছোট্ট সুন্দর একটি টিনের কোঁটা। সহসা আবির্ভাবের কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গীতে বিনোদিনী বললেন “সাবিত্রীকে খাওয়াবার সময় হয়েছে।”

সূর্যকান্ত বললেন “এ মাছটিকে বিলু ‘সাবিত্রী’ বলেই ভেবে নিয়েছে, ডাক্তার। ওরা যখন ছুটিতে জোড় বেঁধে এসেছিল হনলুলু থেকে এই চৌবাচ্চায়—বিলু আর আমি ওদের নাম দিয়েছিলাম সাবিত্রী-সত্যবান। ছুটিই দেখতে একরকম—গুলিয়ে যেত কন্টো সাবিত্রী, কন্টো সত্যবান।”

বিনোদিনী বললেন “চলে গেছে সত্যবান, রয়ে গেছে সাবিত্রী।

মেয়ে-প্রাণ সহজে যায় না, বরাট মশাই ।”

হয়তো খেয়াল হলো অপরিচিত নবাবের সামনে কথাটার সুর—
হয়তো ভাষাও—অস্বরকম হলে ভালো হত । তাই আবহাওয়া বদলে
দেবার জন্তে আমার দিকে তাকিয়ে বিনোদিনী বললেন “আপনাকে পেয়ে
বড় নিশ্চিন্ত হলাম, ডাক্তার । ভগবানই আপনাকে পাঠিয়েছেন ।”

“ভগবান নয় । ভুবনবাবু ।” বললেন সূর্যকান্ত ।

হাসলেন বিনোদিনী । নিখুঁত মুক্তোর সারির মতো ঝকঝকে সাদা
তীর ছপাটি দাঁত । বললেন “ভগবান কাকে দিয়ে, কখন কাকে কেন
পাঠান বোঝা শক্ত, বরাট মশাই ।” মনে হলো আবার একটা রহস্যময়
হাসির মৃদু আভাস সহসা খেলে গেল তীর মুখে ।

এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না সূর্যকান্ত । জবাব দেবার প্রশ্নও
এ নয় ।

“দাসীকে দিয়ে আপনার চা জলখাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিজে
আসতে পারিনি । ক্রটি মার্জনা করবেন, ডাক্তারবাবু ।” বললেন
আমাকে বিনোদিনী । “নবুকে নিয়ে বড় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল
অনেকক্ষণ ।”

সূর্যকান্ত বললেন “আবার বৃষ্টি সেইরকম—?”

“হ্যাঁ, আজকেও । ঠাণ্ডা করতে বড় বেগ পেতে হয়েছে ।”

লক্ষ্য করলাম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সূর্যকান্তর মন । তিনি বললেন
“এভাবে যদি গুর বাড়াবাড়ি বেড়ে চলতে থাকে, শেষকালে একদিন
হয়তো বড় বেগ পেয়েও ওকে ঠাণ্ডা করতে পারবে না, বিষ্ণু । ...কিন্তু
তুমি এসে পড়েছ, এখন আর ভাবনা নেই, ডাক্তার । আমাদের কাছে
ষা কঠিন রহস্য, তোমার কাছে হয়তো তা জলের মতো পরিষ্কার । শরীর
আর মন—তুই তোমার এক্সিয়ারে । ...বিষ্ণু, এবারে খাওয়াও তোমার
সাবিত্রীকে । ডাক্তার এখন আর বাইরের অতিথি নয়, আমাদের ঘরের
লোক ।”

রামধনু-রঙা মাছটিকে খাওয়াতে লাগলেন বিনোদিনী। ফলস্বরূপ টিনের কোটোর ভেতর থেকে ছোট ছোট খাবারের দানা ওপর থেকে একটি একটি করে ফেলে দিতে লাগলেন তিনি, আর মাছটি খেতে লাগল ধীরে ধীরে। আমার অস্তিত্ব কিছুক্ষণের জন্তে ভুলে গেলেন সূর্যকান্ত বরার্ট; যুদ্ধনেত্রে দেখতে লাগলেন বিনোদিনীর সেই অনায়াস জাহ্ন। মনে হলো, রঙিন কলনায় ঐ চৌবাচ্চার রঙিন মাছের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন তিনি, ভাবছেন বিনোদিনী সম্বন্ধে আপন হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন তাঁকে, আর তিনি খেয়ে চলেছেন একটু একটু করে রসিয়ে রসিয়ে পরম তৃপ্তিতে।

কেন জানিনে, হঠাৎ আমার একবার মনে হলো যেন বিনোদিনীর চোখ দিয়েই দেখছি চৌবাচ্চায় ঐ রঙিন মাছটিকে। সে যেন সাবিত্রী নয়, সত্যবান—আর সত্যবানের চেহারায় কোথায় যেন সূর্যকান্তের আভাস। চৌবাচ্চার মুখোমুখি বিনোদিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সূর্যকান্ত।

মাছটিকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ানো শেষ করে বিদায় নিয়ে অন্তরে চলে গেলেন বিনোদিনী।

কিন্তু এভাবে গল্প বলতে গিয়ে আমি হাঁফিয়ে উঠছি।

এবারে তাই কায়দা বদলানো যাক।

কলকাতার মাইল বারো দূরে এই বাগানবাড়ির স্বর্ষ নিয়ে একটা মামলা বেধেছিল। মামলায় হেরে গিয়ে এমন পছন্দসই নিরালা বাগানবাড়িটি হারাবেন বলে ভয় করছিলেন নির্জনতাপ্রিয় সূর্যকান্ত। তাঁর পক্ষের উকিল হলেন ভুবন দত্ত। মামলা জিতেছিলেন সূর্যকান্ত। তাঁর ধারণা ভুবন দত্তের অসামান্য ওকালতি প্রতিভার দৌলতেই তিনি মামলা জিতে পেরেছেন, তা না হলে নিশ্চয়ই বিজ্ঞীরকম হেরে যেতেন। সেই থেকে ভুবন দত্ত তাঁর কাছে একজন কেট্টো-বিট্টু বিশেষ, ভুবন দত্তের বাক্য তাঁর কাছে বেদবাক্য। ভুবনকাকাকে তিনি

বানিয়ে নিয়েছেন তাঁর আইন উপদেষ্টা—লিগ্যাল অ্যাডভাইজার। প্রতিমাসে ঐ বাষদে ভালো মাসোহারা পান ভূবনকাকা—পানি, মানে তাঁকে নিতেই হয় নাছোড়বান্দা সূর্যকান্তর কাছ থেকে। গ্রহীতার চাইতে দাতার ব্যগ্রতা বেশী।

যখন থেকে কাহিনী শুরু করেছে, তার সামান্য কিছুদিন আগে মাত্র ঐ নিরালা বাগানবাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেছেন বরাট পরিবার। স্থান, পরিস্থিতি, আবহাওয়া সব কিছু পরম পছন্দ হয়েছে সূর্যকান্তর। শহর থেকে দূরে লোকসমাজ থেকে যদুৱ সম্ভব বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চান তিনি। লোকের ঈর্ষা, কৌতূহল, সহানুভূতি কিছুই কুড়োতে চান না।

“একজন ভালো অথচ বিশ্বস্ত ডাক্তার ঠিক করে দিতে পারেন ভূবনবাবু? ফ্যামিলি-ফিজিশিয়ান?” বলেছিলেন সূর্যকান্ত। “গোপন কথা যার কাছে খুলে বলা যাবে, ঘরের লোকের মতন দরদী হয়ে চিকিৎসা করবে যে ডাক্তার, সর্বদা শুধু পকেট মারবার ফন্দি আঁটবে না। দক্ষিণা তাঁকে আমি দেবো, প্রাচুর দেবো, ভূবনবাবু; না চাইতেই দেবো। ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন, আর কৃপণ বানাননি। শুধু চাই প্রাণের বন্ধুর মতো দরদী ডাক্তার, অথচ যার আছে অভিজ্ঞতা আর হাতযশ।”

“দেবো আপনাকে। ঠিক যেমনটি চান তার চাইতেও বেশী। ডাক্তার ত্রিলোচন ত্রিপাঠী। আমার ভাইপো। হ্যাঁ, ভাইপোর চেয়েও বেশী।” বলেছিলেন ভূবনকাকা।

“আপনার ভাইপো !!!!!” আনন্দে চিৎকার করে বলেছিলেন সূর্যকান্ত। “তাকে আমার চাই-ই, ভূবনবাবু। তাকেই আমার চাই।”

ভূবনকাকা বলেছিলেন “নিশ্চয় পাবেন। আমার কথা ফেলতে পারবে না ত্রিলোচন।”

এরই ফলে সূর্যকাস্ত্র বরাট পেয়েছিলেন আমাকে। আসল কথা, আমারই বরাত খুলে গিয়েছিল বরাট-বাড়ি থেকে মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা হয়ে। সূর্যকাস্ত্র সেই বাগানবাড়িতেই দোতলায় চারিদিক খোলা সবচেয়ে ভালো ঘরে আমি থাকতে লাগলাম রাজার হালে। আমার সুখ-সুবিধার যতরকম সম্ভব ব্যবস্থা করে দিলেন সূর্যকাস্ত্র।

কলকাতার বাজার থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ি সেজ্ঞা আমার কলকাতার চেয়ারে রোগী দেখা চলতে লাগল রোজ বিকেলে দু ঘণ্টা করে। যাতায়াতটা, বলা বাহুল্য, বরাট বাগানের গাড়িতেই হতো। দু চারদিনের মধ্যেই বরাট পরিবারের রহস্য আমার কাছে দ্রুতবেগে পরিষ্কার হতে শুরু করল।

সূর্যকাস্ত্রর সঙ্গে একদিনের কথা বলি :

“তোমাকে খুলে বলতে তো বাধা নেই, ডাক্তার।” বললেন সূর্যকাস্ত্র। “বাপের মত মজবুত দেহযন্ত্র আর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য পায়নি নবকাস্ত্র, কিন্তু বাপের রক্ত থেকে নিজের রক্তে সংক্রামিত লাম্পটের নেশায় তো তার জন্মগত অধিকার। আমি তার সে অধিকার অস্বীকার করিনি, ডাক্তার। তার দেহে মনে যখন এলো যৌবনের জোয়ার, সেই জোয়ারে বেড়বার উদ্দাম স্বাধীনতা আর পূর্ণ সুযোগ আমি তাকে দিলাম। তাবলাম, যৌবনে নিজেকে কোনোরকমেই বঞ্চিত করিনি, ছেলেকে বঞ্চিত করব কোন্ অধিকারে? শুধু হুঁশিয়ার হলাম, একটা ছুরারোগ্য ব্যাধি বাধিয়ে না বসে। কিন্তু পেটরোগা ভোজনলোভীর পঞ্চান্নব্যঞ্জনী রাজভোগের খাঙ্কা সইল না। কুচো-চিংড়ির প্রাণশক্তি নিয়ে ডন-জুয়ান হওয়া যায় না, ডাক্তার। খাঙ্কার জের সামলাতে সমুদ্রের ধারে কিছুদিন হাওয়া বদল করে এলো নবকাস্ত্র। বিবেকের কাছে পরিষ্কার রইলাম আমি—ছেলে কোনদিন বলতে পারবে না, বাপ তাকে বে-লাগাম লাম্পটের স্বাদ নেবার পুরো সুযোগ দিতে এককোঁটা কল্পন করেছে।

‘কি বলে ডাক্তার?’

আমি বললাম “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কিন্তু অত দরাজ দিল হওয়া আমার উচিত হয়নি, ডাক্তার।” বললেন সূর্যকান্ত। সবার সব সময় না, এইটে বোঝা উচিত ছিল আমার। বুঝিনি বলে আফসোস করি, তাও নয়। কোনো কিছুই জগ্গেই আফসোস করে না সূর্যকান্ত বরাট। হাওয়া বদলে ফিরে এলো নবকান্ত, ওষুধে টনিকে ডাক্তারে নাসে’ অনেক টাকা উড়িয়ে। কিন্তু কি যেন হলো ওর। উডু উডু মন, বুরু বুরু চোখ, হুরু হুরু বুক। ‘এইবারে একটি টুকটুকে বোঁ এনে দিন খোকাকে’—বললে বিনোদিনী। মানুষ করেছে সে-ই নবকান্তকে, নবকান্ত তাই বিনোদিনীর কাছে খোকা, চিরদিনের খোকা। তারপর যে লোভ দেখালে বিনোদিনী, সূর্যকান্ত তা সামলাতে পারলে না, ডাক্তার।”

‘কী সে লোভ?’—মনের এ প্রশ্ন মুখে আনলাম না। জবাব তবু পেলাম।

“বছর ঘুরে টুকটুকে বোঁমার কোল জুড়ে আসবে আমার একটি টুকটুকে নাতি, বরাট বংশের নতুন বংশধর—এই লোভ আমাকে দেখালে বিনোদিনী।” বললেন সূর্যকান্ত। “মনের তলায় অনেকদিন থেকে গোপনে জগ্গেছিল ঠিক এই লোভেরই পদ্ম কুঁড়ি, বিনোদিনীর কথার জাছ-হাওয়া লেগে এবার ফুটে উঠলো সবগুলো পাপড়ি মেলে। সোজা কথায় আমি বোঁমা পাবার জগ্গে যেমন ক্ষেপে উঠলাম—বোঁ পাবার জগ্গেও তেমন ভয়ানক ক্ষাপা ক্ষেপেনি নবকান্ত।”

“তারপর?”

তারপর সূর্যকান্ত সকল খোঁজা ধগু করে, খবরের কাগজে “বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বাঙালী ধনীর তরুণ, সুপুরুষ, সচ্চরিত্র ও স্বাস্থ্যবান একমাত্র পুত্রের জন্ম ১৯ বছরের অনধিক স্বাস্থ্যবতী এবং প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। মধ্যবিত্ত বা গরীব পরিবারে আপত্তি নাই।”—বিজ্ঞাপনের

জবাবে আগে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ঘটিলে, তারপর এসে সূর্যকান্তর বাড়িতে সসংকোচে দেখা দিলেন—ম্যাকিন্টস, ভটচাষি, অ্যাণ্ড কোম্পানির কেরানী জগমোহন রুদ্র ।

সূর্যকান্ত শুধালেন “মেয়েটি প্রকৃত সুন্দরী তো ?”

জগমোহন রুদ্র বিনীত কণ্ঠে বললেন “আজ্ঞে, দেখলে আপনার হয়তো অপছন্দ হবে না ।”

ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বললেন সূর্যকান্ত । গাড়ীতে রুদ্রকে তুলে নিয়ে গেলেন রুদ্রের ডেরায় । চমকে উঠলেন জগমোহন রুদ্রের ভাগনী পদ্মাকে দেখে । আঁধার ঘেরা আঁস্তাকুড়ে অমূল্য হীরের টুকরো জ্বলজ্বল করছে যেন । “বয়স কত হলো ?” শুধালেন সূর্যকান্ত । “আজ্ঞে, আঠারোয় পা দিয়েছে ।” বললেন জগমোহন । “পছন্দ হলো কি আপনার ?”

সূর্যকান্ত বললেন “এ যে রাজ্জরানী হবার মেয়ে, রুদ্র মশাই ।”

“আপনার ঘরে গেলে তো রাজ্জরানীই হবে আজ্ঞে ।” বললেন জগমোহন রুদ্র ।

“আমার সবেধন নীলমণি আমার সোনার টুকরো ছেলে, আমার বৃকের একটি পাঁজর ।” বললেন সূর্যকান্ত । “সেই সোনার টুকরোর পাশে তোমার হীরের জ্যোতি দেখতে পেলো, তারপর আমি মুখে মরতে পারবো, মা ! যাবে মা তুমি আমার ঘরে ?”

নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল পদ্মা ।

“বুড়োকে কি খণ্ডর বলে পছন্দ হয়নি, মা ?” শুধালেন সূর্যকান্ত ।

জগমোহন রুদ্র ভাগনীকে বললেন “মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোকা মেয়ে ? বল পছন্দ হয়েছে ।”

মামার কথা রেখে পদ্মা তেমনি মাথা নত রেখেই বললে, “হয়েছে ।”

“শুধু হয়েছে বললেই হয় ? পেন্নাম করতে হয় যে ।” বললেন, মামা জগমোহন । এবারেও মামার অবাধ্য হলো না পদ্মা । নত

হয়ে প্রণাম করল সূর্যকান্তকে । সৌভাগ্যবতী হও, মা ।” আশীর্বাদ করলেন সূর্যকান্ত ।

“তা তো হতেই চলেছে আজ্ঞে ।” বিনীত হাসি হেসে বললেন জগমোহন ।

মেয়েটিকে বিস্ময়মুগ্ধ, পলকহীন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সূর্যকান্ত । এমন আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে তিনি জীবনে দেখেননি । চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর ।

কিন্তু তিনি অনুভব করলেন এবারে এমন কিছু কথাবার্তা কইতে চাইছেন জগমোহন, যা তিনি ভাগনীকে শোনাতে চান না ; পদ্মাকে এবারে অন্দরে ফেরত পাঠানো দরকার । সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, “তোমায় আর কষ্ট দেবো না, মা । এবার তুমি ভেতরে যেতে পারো ।”

নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল পদ্মা, অপরূপ সুন্দর ধীর পদক্ষেপে । যেটুকু সময় লাগল তার অদৃশ্য হয়ে যেতে, তারই দিকে তাকিয়ে রইলেন সূর্যকান্ত ।

“এ মেয়েটিকে আমার চাই, রুদ্রমশাই ।” বললেন তিনি “অবশ্য আমাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে যদি আপনারা—”

“ছি ছি ছি ছি ছি ! খোঁজখবরের কথা বলে লজ্জা দিচ্ছেন আমাকে । আপনি হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ ।” বললেন জগমোহন রুদ্র । “তা ছাড়া খোঁজটোজ যা নেবার তা আমি আগেই নিয়ে নিয়েছি যে । আপনিই বরং যদি আমাদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে চান তাহলে—”

“কিছু দরকার হবে না, রুদ্রমশাই । শাস্ত্রে বলেছে—স্ত্রীরঙ্গং হুঙ্কুলাদপি । মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে, মেয়েটিকে নিয়ে যাবো ঘরের লক্ষ্মী করে । ব্যাস্ !”

“কিন্তু তার আগে আমার হুঁচরটে নিবেদন আছে ।” বললেন

জগমোহন রুদ্র ।

“বলুন ।” বললেন সূর্যকান্ত ।

“পদ্মা আমার বাপ মা মরা ভাগনী ।” বললেন জগমোহন ।

“তা তো জানি । চিঠিতেই লিখেছিলেন আপনি ।”

“কিন্তু সব কথা চিঠিতে লিখিনি আজ্ঞে । লেখা যায়ও না ।” বললেন জগমোহন । পদ্মার মা আমার দূর সম্পর্কের বোন, তবু বোন তো বটে । সে যখন সিঁথের সিঁছর মুছে কচি মেয়েটাকে হাত ধরে এসে ‘দাদা’ বলে কেঁদে পড়ল,—সে আজ দশ বছরের কথা—তখন তাকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না, আমার অভাবের সংসারেও আশ্রয় দিতেই হলো । সেই থেকে এদের ছুজনের খাওয়া পরা—অসুখ বিসুখে ডাক্তার ওষুধ সবই চালাতে হয়েছে । খরচা হিসেব করলে মোট হাজার ছয়েক টাকা তো হবেই । তা ছাড়া জগদীশের ব্যামোতেও—জগদীশ, মানে আমার বোনাই—চিকিৎসের ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত বাঁচলে না বটে, কিন্তু ওষুধে ডাক্তারে আমার পাক্ষা দু’হাজার টাকা জলের মতো বেরিয়ে গিয়ে ছাপোষা মানুষ আমি দেনায় তলিয়ে গেলাম । হুদে আসলে যখন বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে উঠল তখন গিন্নীর গহনা বন্ধক দিয়ে নতুন ধার করে পুরোনো দেনা শুধতে হলো । তারপর...”

ইঙ্গিতটা বুঝে নিলেন সূর্যকান্ত । নগদ দশহাজার টাকার রফা হলো । পুত্রবধূকে দূর সম্পর্কের মামার কাছে ঋণী রাখবেন না তিনি । বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল । চোখের জল খানিকটা ফেললেন জগমোহন রুদ্র, পদ্মার মা’র কথা ভেবে । মাত্র তিন মাস হলো সে মারা গেছে । মাত্র এই ক’টা মাসের জন্তে বেচারী দেখে যেতে পারল মা তার মেয়ে রাজরানী হতে চলেছে ।

“আরেকটি বিনীত নিবেদন আছে আজ্ঞে ।”

“কি ?”

“আপনি শুধু আমার ভাগনীর জগদ্ধাত্রীর মতো রূপটাই দেখলেন।
গুণের কথাটাও বলি। পাকা ছবি আঁকিয়ে ছিল পদ্মার বাপ—
জগদীশ। পদ্মা বাপের গুণ পেয়েছে। জগদীশ মরবার সময় আমার
হাত ধরে বলে গিয়েছিল পদ্মাকে যেন আমি শিল্পী হবার সবরকম
সুবিধে করে দিই। আমার সাধ্যমতো দিয়েও ছিলাম। আপনার
ঘরের লক্ষ্মী করে যখন নিয়ে যাবেন পদ্মাকে, তখন—”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়।” বললেন সূর্যকান্ত। “স্টুডিও করে দেবো
বাড়িতে—ওরা ছুটিতে একসঙ্গে শিল্পের সাধনা করবে।”

আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য যোগাযোগ-প্রতিভা বিধাতার!
নবকান্তর শিল্প প্রতিভা যেমন অসাধারণ, তেমনি তারি সুযোগ্যা
ীবনসঙ্গিনী কী অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ভাবে মিলিয়ে দিলেন তিনি!

একেই বলে রাজঘোটক, ভাবলেন সূর্যকান্ত। কী সর্বনাশ হত
এমন মেয়ে যদি কোনো গরীব ঘরে, কোন অপদার্থ স্বামীর হাতে
পড়ত! ব্যর্থ হয়ে যেত এমন অমূল্য একটি জীবন! মেয়েটাকে
বাঁচিয়েছেন তিনি এমন সর্বনাশ থেকে, এই ভেবে গভীর আত্মপ্রসাদে
ভরে উঠল তাঁর মন। মনে হলো এই মেয়েটির সেবায় লেগেই তাঁর
অজস্র অর্থ সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করবে।

সূর্যকান্ত বরাটের পুত্রবধু হয়ে এলো পদ্মা। বরাটের ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট
থেকে দশ হাজার টাকা গেল জগমোহন রুদ্রের পকেটে। তারপর
থেকে আমি যখন ডাক্তার হয়ে বরাট-বাগানে প্রথম ঢুকলাম তার ভেতর
পুরো তিন বছর পার হয়ে গেছে।

“গত ছ’বছর ধরে প্রতিদিন আশা করছি শুনতে পাবো ওদের
কুমার-সম্ভবের খবর।” বললেন সূর্যকান্ত। “কিন্তু আমার সব প্রতীক্ষা
ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে ওদের একেবারেই খোঁজ নেই। ছুটিতে
দিন রাত আছে শুধু আর্ট নিয়ে। কুক্ষণে ওদের স্টুডিও বানিয়ে
দিয়েছিলাম আমি। বরাট বংশের নতুন প্রদীপ জ্বালবে না নবকান্ত,

বরাট বংশ রক্ষা পাবে না, এ আমার সহিবে না, ডাক্তার। বিহিত একটা তোমাকে করতেই হবে। ওদের দুজনকে তুমি একটু—”

আমি বললাম “নিশ্চয় দেখব। কিন্তু বরাট বংশ চালু রাখবার জন্তে আপনি এত ব্যস্ত কেন? আপনিই তো বলেছেন বরাট আপনাকে জন্ম দেননি।”

হাসলেন সূর্যকান্ত, যেন শিশুর মুখে কোনো শিশুসুলভ বুলি শুনে। বললেন “জন্ম দেওয়াটা তেমন শক্ত কাজ নয় ডাক্তার, শক্ত হচ্ছে জন্ম নেওয়া। মাসের পর মাস অন্ধকার খুপারির ভেতর আটকে থেকে, তারপর একদিন বেরিয়ে এসে অন্ধকার অভ্যস্ত চোখে হঠাৎ আলোর ধাক্কা খেয়ে ককিয়ে কেঁদে ওঠা। কেঁদে ওঠাটাই তো দম্বর। কি বলো ডাক্তার?”

“হ্যাঁ, নবজাতকের কাঁদাটাই দম্বর।”

“কিন্তু এই দম্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল নবকান্ত। ভূমিষ্ঠ হয়ে সে কাঁদেনি। কাঁদে না, কিছুতেই কাঁদে না। তখন সবাই বললে—সর্বনাশ, কাঁদে না যে! শিগগির কাঁদাও। ছনিয়ার এই দম্বর, ডাক্তার, ছনিয়া ব্যতিক্রমদের বরদাস্ত করতে চায় না, তাদের ছুরমুশ করে এক ছাঁচে ঢালাই করে ফেলতে চায়। প্রতিভারা হচ্ছে এই ব্যতিক্রম, প্রতিভা মানেই বিদ্রোহ। তাই জন্মেই বিদ্রোহ করলে নবকান্ত। কাঁদলে না। শেষটায় সবাই মিলে অনেক কায়দা করে তাকে কাঁদালে।”

আমি বললাম “এক্ষেত্রেও হয়তো ওর প্রতিভা কাজ করেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বজায় রেখে চলেছে নবকান্ত।”

“সেই বিদ্রোহ ডাক্তারী কায়দায় দমাতে হবে তোমাকে, ডাক্তার।”
ব্যাকুল মিনতির স্বরে বললেন সূর্যকান্ত।

কিন্তু হুটির ভেতর একটি রঙিন মাছের অতি-সাম্প্রতিক মৃত্যুতে একটি অশুভ ইঙ্গিতের ভয় করছিলেন সূর্যকান্ত। বললেন “ওদের

ছুটিতে দেখেছিলাম আশ্চর্য মিল, এ ওকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। ওদের কথা ভেবেই আনিয়েছিলাম এই মন্তব্য-দৃষ্টিকে—ভাবতাম একটি নবকাস্ত, একটি পদ্মা। ছুটিই হুবহু এক রকম, তাই জানিমে কোনটি গেল—নবকাস্ত, না পদ্মা? জানিমে এ কিসের ইঙ্গিত, কাকে আমি হারাব—পুত্র, না পুত্রবধু?”

অভয় দিলাম তাঁকে, কিন্তু মনে মনে খুব অভয় আমি নিজেকেও দিতে পারছিলাম না। বরাট বাগানে আবহাওয়াটা কেমন যেন রহস্যময়, অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল।

এবার তাহলে খুলেই বলি। পদ্মাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম বললে কিছুই বলা হয় না। ওর অসামান্য রূপের মাদকতা আমার শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল বললে খানিকটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়। মনে হতে লাগল পদ্মার জগৎ আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু অনায়াসে ত্যাগ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক বান্দরের গলায় অনেক মুক্তোর হার দোলে, কিন্তু নবকাস্তুর পাশে পদ্মাকে দেখে মনে হলো বিখ্যাত এই প্রবাদটির এমন সার্থক, এমন মর্মান্তিক প্রয়োগ জগতে আর কোথাও হয়নি। এতবড় দুঃসহ ট্রাজেডিও আমার চোখে আর কখনো পড়েনি। অথচ সূর্যকাস্তুর নিশ্চিত এবং নিশ্চিত বিশ্বাস এরা ছুজনে ছুজনকে পেয়ে মর্ত্যে স্বর্গস্থ অমুভব করছে। বিনোদিনীও তাই ভাবতেন কি না বোঝা যেত না তাঁর রহস্যময় চলাফেরা, ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তা থেকে। পদ্মার প্রতি আমার হৃদ্যর আকর্ষণ, তার সম্বন্ধে আমার গভীর দুর্বলতা পাছে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে বা স্নানিকের তুলে ধরা পড়ে যায় বিনোদিনীর অস্তিত্ত্ব মেরেলী চোখে, সেই ভয়ে ভীত থাকতাম আমি।

সূর্যকাস্তুর দিক থেকে আমার কোনো ভয় ছিল না। তিনি জানতেন আমি শুধু ভাস্কর; ভাস্কর যে শুধুই ভাস্কর নয়, রক্ত মাংসের মানুষও

বটে, এই সোজা কথাটা সোজা বলেই বোধকরি তাঁর খেয়াল এড়িয়ে যেতো। তাঁর ধারণা মানুষের হৃদয় আমার কাছে শুধু স্টেথোস্কোপের খোরাক, রক্ত চলাচলের প্রাণকেন্দ্র। তাঁর বিশ্বাস—দেহের কাব্য আমাকে দোলা দেয় না, মানুষের দেহ আমার কাছে শুধু বিভিন্ন রোগ সম্ভাবনার তীর্থভূমি, অথবা নানারকম মিক্সচার, প্রলেপ আর ইন্জেকশনের প্রয়োগ-ক্ষেত্র।

আর নবকান্ত ? ইংরেজিতে যাকে বলে ইডিঅট, সে ছিল ঠিক তাই। মহামূর্খ বা জড়ভরত বললে হয়তো ওর খানিকটা বর্ণনা হয়। পদ্মার সান্নিধ্যে তো বটেই, এমন কি তার কণ্ঠস্বর বা পায়ের ধ্বনি শুনলেও যে আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু চঞ্চল হয়ে ওঠে, জাগরণের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই যে আমি পদ্মার কথাই ভাবি, এ কল্পনা করার মতো চিন্তাশক্তিও তার ছিল না। স্টুডিওতে এখানে ওখানে সাজানো আর এলোমেলো ছড়ানো তার আঁকা অর্ধহীন উদ্ভাসিত ছবি দেখে একবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভান করতেই কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে আমার একান্ত বশব্দ ভক্ত হয়ে উঠল নবকান্ত। আমার আর পদ্মার মেলামেশার বাধা না থাকলে যে তার পক্ষে সেটা কোনোরকমেও কৃতিকর হতে পারে, এ সন্দেহ তার মনে জাগেনি। তা ছাড়া শরীরের কিছু কিছু অস্বস্তিকর আর বেদনাদায়ক উপসর্গ আমার চিকিৎসায় দ্রুত নিরাময় হওয়ায় সে আমার প্রতিভা-মুগ্ধ হয়ে পড়ল।

আশ্চর্যের বিষয়, নবকান্তর প্রতি পদ্মার আচরণে ব্যবহারে হাবভাবে কখনো এতটুকু হেলা অশ্রদ্ধা বা অপ্রেম প্রকাশ পেতো না। কিন্তু আমার মনে হতো—অসম্ভব, পদ্মার মতো মেয়ে নবকান্তর মতো স্বামী পেয়ে কখনোই সুখী হতে পারে না। এ তার অভিনয়, মর্যাদাসিক অভিনয়। মিথ্যের বিধাতার ওপর এ তার প্রতিশোধ নেবার কৌশল মাত্র।

জেন্নি করে নানা কারণে একটি সন্ধ্যা আমার মনে ধলিত হয়ে

উঠেছিল : ক্রান্তবেগে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠছে পদ্মা, আর আমার প্রতি আকর্ষণ যত বেশী ছুঁবার হয়ে উঠছে, পতিশ্রোমের অভিনয় তত বেশী জোরালো করে তুলবার চেষ্টায় সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবং এ ব্যাপার দেখছেন বুঝছেন বিনোদিনী, কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রয়েছেন, কোনোরকম বাধা দেবার প্রয়োজন বোধ বা চেষ্টা করছেন না।

স্টুডিওতে যেন মরিয়া হয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলেছে নবকান্ত, যেন মস্ত এক দামী কনট্রাক্ট নিয়ে ফেলেছে—নির্ধারিত সময়ের ভেতর বহুসংখ্যক ছবি এঁকে দিতে হবে। সবগুলো ছবিতে মডেল হতে হচ্ছে পদ্মাকে। অতি পরিশ্রমে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল নবকান্ত। শুরু হলো বিভিন্ন উপসর্গ, তাদের ভেতর মাঝে মাঝে প্রলাপ বকাও একটি। শুরু হলো ডাক্তারী দায়িত্ব। অসুস্থতার উপসর্গগুলো শুধু দেহের নয়, মনেরও বটে। মনে হলো অনেক কথা জমে আছে ওর বুকের ভেতর, আমাকে একান্তে বলে বুক হালকা করে ফেলতে না পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

একা ঘরে নবকান্ত আর আমি, তখন বললাম “কি বলবে বলো, নবকান্ত।”

“প্রশ্ন করব। সত্যি জবাব দেবেন ডাক্তারবাবু। আমি সহিতে পারব।” বললে নবকান্ত।

চমকে উঠলাম ওর নতুন সুরে, ওর অসামান্য দৃঢ়তায়। এ এক সম্পূর্ণ আলাদা নবকান্ত। একে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, দেবার প্রয়োজনও নেই। বললাম “বলো, সত্যি জবাব দেবো।”

“আমাদের বরাট বংশের নতুন বংশধর আজো এলো না—বাবা যার পথ চেয়ে বসে আছেন। হয়তো পদ্মাও।” ধীরে ধীরে বললে নবকান্ত। “কেন?”

নবকান্তকে আমি পরীক্ষা করেছিলাম। যে অপ্রিয় সত্য আবিষ্কার

করেছিলাম তা নিজের মনেই গোপন রেখেছিলাম। এবার বললাম “কোনদিনই সে আসবে না, নবকান্ত। কারণ তোমার ভেতরে তার বীজ নেই।”

নীরব রইল নবকান্ত। মনে হলো এমনি একটা সন্দেহ তারও মনে জেগেছিল; আমার কথায় শুধু তার সত্যতার যাচাই হয়ে গেল।

“সব মেয়েই সন্তান চায়—তাই না, ডাক্তারবাবু?” প্রশ্ন করল সে।

বললাম “সব মেয়েই চায় কিনা জানিনে। কিন্তু চাওয়াটাই স্বাভাবিক।”

“বাবার সব হিসেবেই ভুল হয়ে গেল, ডাক্তারবাবু।” বললে নবকান্ত। “পদ্মার জীবনটা আমারি জগ্বে নষ্ট হয়ে গেল। আমি ওকে ব্যর্থ করে দিলাম।”

আমি প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে বললাম “না না, নবকান্ত। তুমি কি দেখতে পাও না পদ্মা তোমাকে কত—”

“পাই।” বললে নবকান্ত। “সেইজগ্বেই তো দুঃখ। আমি ওর উপযুক্ত নই, তবু সে আমাকে ঘৃণা করে না, তুচ্ছ করে না। ওর সঙ্গে আমি কতবার জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেছি, একটিবারও সে রাগ করেনি। এ আমি অনেক সয়েছি, ডাক্তারবাবু, আর আমি সহিতে পারছি নে।”

নবকান্ত বলতে লাগল “বাবার বড় বিশ্বাস আমার শিল্প-প্রতিভা অসামান্য। বাবার সে কথা আমি বিশ্বাস করতাম, ডাক্তারবাবু। স্টুডিওতে তাই আপন খেয়াল খুশি মতো ছবি এঁকে গেছি। তারপর পেলাম পদ্মাকে। পদ্মার চাইতে সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নেই, ছিল না, হতে পারে না, ডাক্তারবাবু। পদ্মা ক্লান্ত হয়নি, বিরক্ত হয়নি, রাগ করেনি। ঐসব ছবির ভেতর আমি পদ্মাকেই দেখতে পেতাম নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে। তাই নিজের আঁকা সে সব ছবি দেখে নিজেই আমি মুগ্ধ হতাম। ভাবতাম একদিন পৃথিবীর লোক তেমনি

মুখ হবে । কিন্তু এখন বুঝতে পারছি পৃথিবীর লোক উপহাস করছে, তারা তো আমার চোখ দিয়ে দেখবে না । আমার ঐ ছবিগুলো সব যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়, ডাক্তারবাবু ।”

তারপর একটু থেমে, একটু ভেবে বললে “না না, পদ্মাকে দেখে দেখে আঁকা ছবিগুলো—ওরা বেঁচে থাক ।”

অশ্রুখ বেড়ে চলল নবকান্তর । বাড়তি রোধ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হতে লাগল । মনে হলো যেন এবারে মরবার জন্তে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, কিছুতেই তাকে আর বাঁচানো যাবে না । সে আমার অপরাধী মনের কল্পনা কি না জানি না, কিন্তু মনে হলো ‘ইন্ডিঅর্ট’ নবকান্তর চোখে যেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি এসেছে, আর সে দেখতে পাচ্ছে আমার মনের অন্তরমহল । সোজা ভাষায় বলি, আমার মনের কোণে উঁকি দিয়েছিল একটি সম্ভাবনার ছবি—সে ছবিতে পদ্মা আর আমার মধ্যবর্তী বাধা ঘুচিয়ে দিয়ে পদ্মাকে মুক্তি দিয়ে চিরতরে সরে গেছে নবকান্ত, আর পদ্মা এসে দাঁড়িয়েছে আমার হাত ধরে, নতুন জীবনের যাত্রাপথে ।

আমাদের দুজনের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যাবে বলেই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে নবকান্ত । পদ্মার জীবন ব্যর্থ করে বেঁচে থাকবে না সে, পদ্মার জীবন ফুলে ফলে সার্থক করবার জন্তে সে মরবে । তার মৃত্যুতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু ডাক্তারী বিবেক এড়ানো গেল না । আমার চাইতেও বড় ডাক্তারের পরামর্শও নেবার ব্যবস্থা করলাম ।

কিন্তু বাঁচানো গেল না । শেষ পর্যন্ত মরে গেল নবকান্ত । হনকলু থেকে আনা ছটি রক্তিন মাছের একটির মৃত্যুতে সূর্যকান্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলেন, সে-আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো ।

ভেবেছিলাম চিংকার করে কেঁদে উঠবেন সূর্যকান্ত অধীর হয়ে । কিন্তু অন্নীর তাঁর ধৈর্য । হিমালয়ের মতো স্থির, অচঞ্চল; পদ্মীর

সূর্যকান্ত । শুধু বললেন “বরাট বংশের শেষ ঝাতি নিবে গেল । যাবার আগে আলিয়ে রেখে গেল না নতুন বাতি । তবু ছুঃখ করে তাঁর আত্মাকে ছুঃখ দেবো না, ডাক্তার । সব ছুঃখ ভুলে থাক সে অনন্ত আনন্দধামে ।”

সত্যটা তাঁর কাছে তারপর ধীরে ধীরে প্রকাশ করলাম । বললাম নতুন জীবনের বীজ ছিল না নবকান্তর দেহে । বরাট বংশকে নতুন বংশধর দিতে কোনো দিনই সে পারত না । শুনে চমকে উঠলেন সূর্যকান্ত । আমার একটি কথায় তাঁর অনেক দিনের বড় আদরের একটি ভুল যেন এক নিমেষে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ।

“ভুল, ভুল—আগাগোড়াই হয়তো আমার ভুল, ডাক্তার ।” বললেন তিনি । “একটি জগদ্ধাত্রী মেয়েকে সুখী করতে চেয়েছিলাম । হয়তো উলটে তার জীবনটাকে ব্যর্থই করে দিলাম । অন্ধ দস্ত জেগেছিল আমার মনে, সেই দস্তের মাণ্ডল দিলে একটা ফুলের মতো মেয়ে । ...আর একটা কথা, ডাক্তার । নবকান্ত আমায় বলে গেছে ‘পদ্মা এতদিন বন্দিনী ছিল । তাকে আমি মুক্তি দিয়ে গেলাম । তুমি তাকে মুক্তপাখীর মতো স্বাধীন ডানা মেলে উড়তে দিয়ো, বাবা । তাকে আমি সুখী করতে পারিনি, সে সুখী হোক । তার প্রাণের কোনো আশা, কোনো আকাঙ্ক্ষাই যেন অপূর্ণ না থাকে । এই আমার শেষ ‘অমুরোধ ।’ কথাগুলো ডেলিরিআমের মতো সে বলেছিল বটে, কিন্তু এ তো ডেলিরিআম নয়, ডাক্তার ।”

নীরব রইলাম আমি ।

নেশাএস্তের মতো সূর্যকান্ত বলে চললেন “আমার জীবনেও এক-কালে বসন্তের মরশুম এসেছিল, ডাক্তার । আমি জানি ওর রূপ, ওর মর্ম, ওর ধর্ম । পদ্মার জীবনে এসেছে তারি জোয়ার, সেই পরম লগ্ন । তাকে কে ব্যর্থ করবে, কোন্ অধিকারে ? সবার উপর জীবন সত্য, ডাক্তার । জীবনকে শুকিয়ে রেখে নিম্নের মন্দিরের আরতির বক্সে বাজিয়ে কি হবে ?”

আমাকে বিস্মিত করেছিল নবকান্ত, এবারে বিস্মিত করলেন সূর্যকান্ত। আমি প্রশ্ন করলাম “আপনি বলতে চাইছেন পদ্মা যদি এবারে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে তাতে আপনার কোনো আপত্তি হবে না?”

সূর্যকান্ত বললেন “সেই কথাই তো বলতে চাইছি, ডাক্তার। নবকান্তর শেষ কথায় তো তারই ইঙ্গিত। পদ্মার জীবন তৃপ্তিতে ভরে উঠলে নবকান্তর আত্মা তৃপ্তি পাবে।”

কথাটা অবিশ্বাস হলো না। নবকান্তকে যেন নতুন রূপে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

“পিতৃশ্রদ্ধার অন্ধতায় ভুলে হয়তো মেয়েটার প্রতি অবিচারই করে ফেলেছিলাম।” বললেন সূর্যকান্ত। “এবার সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু এখনই নয়। শ্রাদ্ধশাস্তিটা চুকে যাক, তারপর আমি নিজেই বোমাকে...হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত পদ্মা আমার বোমা বইকি।”

আমাকে ছাড়তে রাজী হলেন না সূর্যকান্ত। বললেন “তুমি তো শুধু নবকান্তর জন্তে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান হয়ে আসনি ডাক্তার, যে সে চলে গেছে বলেই তুমিও চলে যাবে। আমাদের দেখাশোনা করবে কে?”

বলা বাহুল্য, আমার সারা অন্তরও থাকবার জন্তেই উদগ্র হয়েছিল। পদ্মার সান্নিধ্য ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না।

নবকান্ত যেন মরে গিয়ে বৃহত্তর মহত্তর হয়ে উঠল। বরাট বাড়ির সবারই পরম তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠল তার স্টু ডিয়ো। যখন তখন সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সূর্যকান্ত, স্বর্গীয় পুত্রের এঁকে রেখে যাওয়া ছবিগুলো দেখে। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বিনোদিনীও; স্বর্গীয় শিল্পী নবকান্ত বরাটকে, মা না হয়েও, তিনিই একরকম মাহুষ করেছিলেন। আমিও যেন ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখতে দেখতে তাঁদের ভেতর নতুন আলোর আভাস পেলাম। আর পদ্মা? সে বোধকরি দিন রাত্রির

অধিকাংশ সময়ই কাটাতে স্টুডিয়োতে। বিধবার বেশ পরেনি সে। হয়তো নিবেদন ছিল সূর্যকান্তর। হয়তো নবকান্তরও। শৌখিন সুরুশাখা ভেঙে ফেলে দেয়নি হাত থেকে। শোকচিহ্ন হিসেবে বাদ দিয়েছিল শুধু সিঁথিতে সিঁছর। অদৃশ্য হয়নি ললাটের লাল টিপ।

অকাল মৃত্যুর জন্তে মনে মনে নবকান্তকে ধন্যবাদ দিয়ে অধীরভাবে দিন রাত কাটাতে লাগলাম, পদ্মা আর আমার মাঝখানে শোভন দূরত্ব বজায় রেখে। ব্যবধান অনেক দিন সয়ে থাকা গেছে, এখন আর কটা দন মাত্র।

যথাসময়ে চুকে গেল শ্রাদ্ধশাস্তির ব্যাপার। তাতে ছিল গভীর আন্তরিকতা, ছিল না আড়ম্বরের ঘটা। আর সেই উপলক্ষে নবকান্তর আত্মার তৃপ্তির জন্তে জনকল্যাণের কাজে একটা মোটা টাকা দান করে দিলেন সূর্যকান্ত।

পরদিন স্টুডিয়োতে পশ্চিম জানালার ধারে একা বসে ছিল পদ্মা। তন্ময় হয়ে দেখছিল ঈজেলের ওপর রাখা একটি ছবি। নবকান্ত এ ছবি এঁকেছিল পদ্মাকেই মডেল করে; ছবির সঙ্গে আসলের কোথায় মিল আছে খুঁজে বার করা সহজ নয়। সূর্যাস্তের শেষ আলোয় পদ্মাকে দেখে মনে হলো বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য যেন এক হয়ে এসে মিশেছে পদ্মায়।

পদ্মাকে জানালাম আমার ভিক্ষা। বললাম “পদ্মা, এবার আমাকে গ্রহণ করো তুমি। এখন তো আর কোনো বাধা নেই।”

ভেবেছিলাম পদ্মা রাজী হবে, আগ্রহে আকুল হয়ে উঠবে। কিন্তু পদ্মা শুধু বললে “তা হয় না ডাক্তারবাবু।”

চমকে উঠলাম বিস্ময়ে। আহত স্বরে বললাম “যদি তোমার ভুল বুঝে থাকি তাহলে মার্জনা করো। কিন্তু পদ্মা, সত্যি করে বলো, আমাকে কি তোমার ভালো লাগে না, কখনো লাগেনি?”

আত্মহারা হয়ে পদ্মার হাত ধরতে গেলাম। কচুতাবে নয়,

আশ্চর্য শোভন ভঙ্গীতে অনায়াসে হাত সরিয়ে নিয়ে গেল পদ্মা।
অশোভন অসংযমের গভীর লজ্জায় কিরিয়ে নিয়ে এলাম আমার
সমস্যানে প্রত্যাখ্যাত হাতখানা।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে সাহস সঞ্চয় করেই যেন পদ্মা বললে
“মিছে কথা আমি কখনোই বলিনে, ডাক্তারবাবু। আর আমার স্বামীর
প্রিয় স্টুডিয়ার এই পুণ্যতীর্থে বসে মিছে কথা মনে আনাও আমার
পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কুমারী
জীবনে যে সোনার রাজকুমারের স্বপ্ন দেখতাম, আপনাকে দেখে
আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার সেই সোনার রাজকুমার,
এসেছেন বন্দিনী আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। আপনাকে
যত দেখতাম তত বেশী ভালো লাগত। আপনাকে কোনো ছলে
একটিবার দেখবার জন্ত, আপনার কণ্ঠস্বর একটু শুনবার জন্ত আমি
প্রতিটি মুহূর্ত ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। এক এক সময় মনে হতো
আমি বৃষ্টি পাগল হয়ে যাবো। পাছে ধরা পড়ে যাই এই ভয়ে,
আপনার ক্ষেপে মনঃপ্রাণ যত বেশী আকুল হয়ে উঠত ততই বেশী
মরিয়া হয়ে স্বামীর প্রতি মনোমোগ দেবার চেষ্টা করতাম। তখন
যদি আপনি হাত বাড়িয়ে আমার বলতেন ‘চলো’, আমি হস্ততো
অনায়াসে বিনা দ্বিধায় আপনার সঙ্গে চলে যেতে পারতাম। ভয়
করতাম না কাউকে, কিছুকে। কিন্তু এখন—”

“এখন তো কোনো বাঁধা নেই পদ্মা। নবকান্ত তো তোমায় মুক্তি
দিয়ে গেছে।”

“সেই মুক্তিই তো আমার সবচেয়ে বড় বন্ধন, ডাক্তারবাবু! সেই
মুক্তির আলোতেই তাঁকে আমি নতুন রূপে দেখতে পেয়েছি। আজীবন
আমি তাঁকে শুধু ঘৃণা আর অস্বাভাবিক করে এসেছি অতিক্রম। আর
অতিস্বাভাবিক ছল করে। বাইরের রূপ তার ছিল না বলে তার প্রতি
কল্পিত হয়েছিলাম, দেখতে পাইনি তার অন্তরের রূপ, যে অন্তর দিয়ে

আমায় তিনি ভালবেসেছিলেন। সে ভালবাসার ভুলনা নেই, ডাক্তারবাবু।”

আমি বললাম “কিন্তু পদ্মা, তোমার শিল্পী প্রতিভাকে শুধু চেপেই রেখেছিল নবকান্ত, পাছে তুমি তাকে ছাপিয়ে ওঠো। একি ভালবাসা, না স্বার্থপরতা?”

“ভালবাসা যত বেশী গভীর, তত বেশী স্বার্থপর, ডাক্তারবাবু।” বললে পদ্মা। “আমার কাছে আমার স্বামী-ই শিল্পের চাইতে বেশী বড় হয়ে থাকবেন, এই ছিল তার ভালবাসার দাবি। পাছে আমার শিল্প সাধনাই আমার কাছে ওঁর চাইতে বেশী বড় হয়ে ওঠে, এই ছিল তাঁর ভয়। আমাকে হারাবার ভয়। এ ভয় তো ভালবাসা থেকেই আসে, ডাক্তারবাবু।”

বুঝলাম তর্ক করা বৃথা হবে। নবকান্তকে মহীয়ান করে তুলেছে মৃত্যুর জাহ্নু। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে বললাম “শুধু একটা স্মৃতি নিয়ে নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ করে দেবে পদ্মা?”

“ব্যর্থ করব না, ডাক্তারবাবু। সার্থক করে তুলব বাকী জীবনটা শিল্পের সাধনায় কাটিয়ে। শিল্পী বাপের মেয়ে, শিল্পী স্বামীর স্ত্রী আমি। শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাঁদের সম্মান রাখাই হবে আমার জীবনের সাধনা।”

“আমার জীবনটাকে সার্থক করেও তোমার সে সাধনা সফল হতে পারত, পদ্মা। আমিও শিল্পচর্চার ভক্ত। তোমার সাধনার পথে বাধা হতাম না। আমার কথাটা কি একবারও ভাববে না তুমি?”

পদ্মা হেসে বললে “ভেবেছি বইকি। আমার মালা পেলেন না বলে কণ্ঠ আপনায় শূন্য থাকবে না, ডাক্তারবাবু। আপনার গলায় মালা দোলাতে পেলো নিজেকে ধন্য মনে করবে না এমন মেয়ে বাংলাদেশে খুব বেশী মেই।”

বলেই ইঠাৎ গভীর হয়ে গেল পদ্মা। বুঝলাম তার চরম কথা বলা

হয়ে গেছে, এ বিষয়ে আর আলোচনা চলবে না।

গম্ভীর স্বরে সে বললে “একটা বিনীত অনুরোধ আছে আপনার কাছে। আপনি আর এ বাড়িতে থাকবেন না। আমার কাছ থেকে আপনি দয়া করে দূরে চলে যান। আপনি কাছাকাছি থাকলে আমার শুধু হুঃখই বাড়বে। আর আমাকে হুঃখ দিয়ে আশা করি আপনিও তৃপ্তি পাবেন না। রাখবেন আমার অনুরোধ?”

বললাম “রাখব, পদ্মা! আজই আমি চলে যাবো। কিন্তু মাঝে মাঝে কি দেখা হবে না?”

“দৈবাতের কথা কিছু বলা যায় না। কিন্তু দেখা আর না হওয়াই ভালো, ডাক্তারবাবু।”

সেদিনই বিদায় নিলাম সূর্যকান্ত বরাটের কাছ থেকে। “হঠাৎ এ মতি কেন ডাক্তার?” বললেন তিনি।

“হঠাৎ নয়, সূর্যবাবু। কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম।” বললাম আমি। “নবকান্তুর জগ্গেই এসেছিলাম। নবকান্ত নেই,—চললাম—”

বরাট বাড়ির গাড়ি বেরুলো গ্যারাজ থেকে। বিদায় নিয়ে উঠে বসলাম। গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে সূর্যকান্ত বললেন “ঘরে তোমাকে রাখতে পারলাম না, কিন্তু দরকার হলেই ফোন করব, গাড়ি পাঠাব, ডাক্তার।”

বললাম “অচ্ছ ডাক্তার পাঠিয়ে দেবো। আমায় ক্ষমা করতে হবে, সূর্যবাবু। নবকান্তের বরাট বাগানে আমাকে আর আসতে বলবেন না।”

সূর্যকান্ত বরাটকে চোখ মুছতে কখনো দেখিনি। এইবার দেখলাম।

গাড়ি রওনা হল বরাট বাগান ছাড়িয়ে লম্বা কঁাকা রাস্তার ওপর দিয়ে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাগান বাড়ির দোতলায়

স্টুডিয়ার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা, এদিকেই নিবন্ধ তার

বিদায়, শকুন্তলা স্থানাটোরিআম।

বিদায় নিয়ে আসিনি ডাক্তার ত্রিপাঠী বা শেঠজীর কাছ থেকে ; পালিয়ে এসেছি চুপি চুপি সবার অলক্ষ্যে, ঝিরি ঝিরি বর্ষণমুখর বাপ্‌সা সঙ্ঘার অন্ধকারে।

ট্রেন ছুটছে। দ্রুতবেগে দূরে, আরো দূরে সরে যাচ্ছি শকুন্তলা স্থানাটোরিআম থেকে। ট্রেনের চাকাগুলো বিচিত্র সংগীত জাগাচ্ছে লাইনের ওপরে। সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে মনে পড়ছে শেঠজীর সঙ্গে বসে বেতারে শুনেছিলাম ওস্তাদ মকবুল হোসেনের শানাই বাজানো। এখন বাজছে না ওস্তাদ মকবুল হোসেনের শানাই। তবু তার তিলক কামোদ রাগিণীর ঝংকার যেন এখনও কানের পর্দায় কাঁপছে। আর কাঁদছে। এমন মিঠে তিলক কামোদ যে শোনার মত শুনতে পোলে কান্না পায়।

মকবুল হোসেনের তিলক কামোদ বাজানোর কথা মনে করে ছ জন গাইয়ের তিলক কামোদ গাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

তাদের এক জন ছিলেন আমাদের পাড়ার গগন খাজাঞ্চি। দিদিমার একমাত্র নাতি ; মরবার আগেই নাতিকে দিদিমা তাঁর বেশ কিছু নগদ টাকা আর বসত-বাড়িখানা দানপত্র করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বিয়ে-খা করেন নি গগন খাজাঞ্চি, গান চর্চার ব্যাঘাত ঘটবে বলে।

দিদিমা মারা গেলে পর বাড়ির একতলাটা ভাড়া দিয়ে দোতলায় একা থাকতে লাগলেন গগন খাজাঞ্চি। দিদিমা-হীনতায় তাঁর বয়ঃ স্তব্ধিই হল গান চর্চার। বাড়ির উলটো দিকে একটা ছোট্ট ছোটেল ছিল, তার নাম “ভোজন-ভারতী”। সেই ভোজন-ভারতী থেকে

হু বেল। ভাত মাছ ডাল তরকারি আসত, আর ভোরে বিকেলে চা আর টোস্ট আসত ঐ হোটেলেরই রেস্টোরাঁ বিভাগ থেকে। সন্ধ্যায় বাড়িতে ওসবের কোন হালমাই ছিল না, বামেলার ভেতর মাসের শেষে বিল চুকিয়ে দেওয়া। তার জগ্রে চেক-বই ছিল, তা থেকে চেক কেটে সহই কররে দিলেই হল।

অনেক দিন ধরেই আমাদের পাড়ায় “গাইয়ে” নামে তিনি এক ডাকে বিখ্যাত। পাড়ায় যখনই বারোয়ারী উৎসব কিছু হত—বিশেষ করে পূজোর সময়—আমাদের বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাইতেন গগন খাজাকি। তবলা, তানপুরা, হারমোনিয়াম সব তাঁর নিজের। এগুলো ধারা বাজাতেন তাঁরাও তাঁর নিজের লোক, পয়সা-কড়ি কিছু দিতে হলে তিনি নিজেই দিতেন।

আমাদের পাড়ার নিমাই হালদার ছিলেন কালোয়াতি গানের বড় সম্বাদার। তাঁর বাড়িতেও মাঝে মাঝে গানের আসর বসত। গাইতেন গগন খাজাকি। আরও অনেক গাইয়ে।

তিলক কামোদ রাগিণীটাই তাঁর বেশী রপ্ত ছিল। চোখ বুজে গাইতেন “নীর ভরন কায়সে জাউ সখিরি”—ওগো সখি, কেমন করে জলের ঘাটে জল ভরতে যাব, পথের মাঝে যে শ্রাম নটবর ভারি নট-ঘট শুরু করেছে, ইত্যাদি।

এ গান যখনই শুনতেন গগন খাজাকির মুখে, নিমাই হালদার বলতেন, “আহা, এমন গান আর হয় না। বলিহারি, বলিহারি গগন, বলিহারি। চক্রপাণি ভট্টাচার্যির কাছে তালিম পেয়েছিলে বটে।”

কিন্তু পাড়ার আর সবার মতে নিমাই হালদারের এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। তাঁদের মতে গগন খাজাকি যে একেবারে যাচ্ছেতাই গাইয়ে তা অবশ্য নয়, কিন্তু তাঁকে এমন কিছু আহা মরি গাইয়েও বলা যায় না। বড় জোর চলনসই। তা ছাড়া নেহাত পাড়ার লোক বলেই খাড়ির করে তাঁর গান শোনা, নইলে তার গান শোনবার মত ভেমন আর কি ?

সেবার পাড়ার বারোয়ারী সরস্বতী পূজায় বেশ ভাল টাকা উঠল। ঠিক হল গানের জলসা করা হবে দু দিন—এক দিন হবে ক্লাসিক্যাল মানে উচ্চাঙ্গ গান, অল্প দিন মডার্ন অর্থাৎ আধুনিক গান। বিখ্যাত খেয়াল আর ঠুংরি গাইয়ে ওস্তাদ সিকান্দার খাঁ সাহেবের ভাইপো জুলফিকার খাঁ তখন এ শহরে রয়েছেন। বয়স তাঁর তেমন বেশী নয়, কিন্তু ওস্তাদী নাম ডাক বেশী। আমাদের পূজা কমিটির আমোদ-প্রমোদ শাখার সম্পাদক নীলাজি দস্তিদার বললেন “এবারের আসরে ওস্তাদ জুলফিকার খাঁকে আনা দরকার। দুর্দান্ত গাইছে আজকাল। দক্ষিণাও বেশী নয়, মাত্র তিন শ টাকা। ওর মত গুলীর পক্ষে এ কিছু নয়।”

“তা হলে আমাদের গগন খাজাঞ্চি কি দোষ করলে? তাকেও দক্ষিণা দাও।” বললেন দু-এক জন গগন-দরদী।

“আচ্ছা, সে যথাসময়ে দেখা যাবে।” বললেন নীলাজি দস্তিদার। শুনে বোকা গেল আচ্ছাও নয়, যথাসময়ে ভেবে দেখাও হয়ে উঠবে না।

তা যাই হোক, গানের রাত্রে দলবলসহ এলেন তরুণ ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। বিখ্যাত কালোয়াতি জাহুকর সিকান্দার খাঁর ভাইপো। তিন শ টাকা তিনি আগাম নিয়ে নিলেন। তারপর গান খরলেন। দু ঘন্টা গেয়ে উঠে পড়লেন তরুণ খাঁ সাহেব। আরেক জায়গায় গাইতে হবে, সেখান থেকেও আগাম টাকা নিয়ে রেখেছেন।

খাঁ সাহেব উঠে যাবার পর গাইতে বসলেন আমাদের পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চি। শ্রোতাদের বেশির ভাগ উঠে যেতে চাইছিলেন। অনেক করে তাঁদের বসানো হল। বিরক্ত মুখে নিতান্ত ভয়তারা খাতিরে বসলেন তাঁরা। বললেন “খাঁ সাহেবের গানের পর গগন খাজাঞ্চির গান! কিসের পরে কি!”

জমল না। জমল না গগন খাজাঞ্চির গান। তিনি গাইলেন তিলক কামোদ, নিমাই হালদারের ফরমাশ : “নীল তরুন কায়দার

জাউ সখিরি।” গুনতে গুনতে আমার হু চোখ জলে ভরে উঠল। কাপসা চোখে চেয়ে দেখলাম আমারই মত অভিভূত হয়ে উঠেছেন নিমাই হালদার, চোখের জল মুছেছেন কৌচা বুলিয়ে। গুনলাম মাঝে মাঝে বলে উঠছেন “বেঁচে থাকো গগন। এমন গান আর হয় না।”

কিন্তু আসর জমল না। গগন খাজাকির গান থামতে দেখা গেল আসর তার আগেই চার ভাগের তিন ভাগ কাঁকা হয়ে গেছে। ওস্তাদ সিকান্দার খাঁ সাহেবের সাক্ষাৎ ব্রাহ্মপুত্র জুলফিকার খাঁর গানের পর চক্রপাণি ভট্টচার্যের শিষ্য গগন খাজাকির গান প্রতিবেশীদের ভাল লাগে নি। আলোচনা শোনা গেল : “খাঁ সাহেবী তালিম হল গিয়ে আলাদা চিঁজ ! জুলফিকারের ধাক্কা গগন সামলাতে পারবে কেন !”

এর কিছু দিন বাদে পাড়ায় আরেকটি আসর বসেছিল গান-বাজনার। জুলফিকার খাঁকে আনা হল। তিনি এবার চাইলেন পাঁচ শ টাকা। অনেক অমুরোধে কমিয়ে আগাম চার শ টাকায় রাজী হলেন। পাড়ার উত্তোক্তারা গিয়েছিলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাকির কাছে। তিনি বললেন “আমাকে দুশ টাকা দিতে হবে।”

উত্তোক্তারা বিস্মিত হয়ে বললেন “কি বলছেন আপনি ! জুলফিকার খাঁ সাহেব পর্যন্ত মাত্র চার শ টাকায় রাজী হয়েছেন, আর আপনি দুশ টাকা চাইছেন ? কেপে গেলেন না কি ?”

“হ্যাঁ, কেপেই গেলাম। আমাকে গাওয়াতে হলে আগাম দুশ টাকা দিয়ে যান। তা না হলে আত্মন, নমস্কার।” বললেন গগন খাজাকি। ফিরে গেলেন উত্তোক্তারা খাজাকির ঘুষ্টতার কথা ভাবতে ভাবতে।

খবরটা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। বিপিন চাট্টোয়, সলিল দত্ত, বঙ্কিম ভট্টাচার্য, দীপেন শাসমল প্রমুখ পাড়ায় যারা গানের সমঝদার বলে খ্যাত, তাঁরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাকির আশ্চর্য ঘুষ্টতার কথা ভেবে।

“লোকটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।” বললেন তিনকড়ি গাঙ্গুলী। “বামন হয়ে চাঁদের নাগাল পেতে চায়।”

মাথা খারাপ হয়েছিল কিনা জানি না, এর পর শোনা গেল বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সোজা কাশী চলে যাচ্ছেন গগন খাজাঞ্চি। সেখানেই বিশেষজ্ঞের চরণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। বাকী জীবন মানে হয় তো অনেক বছর, কারণ গৌফ আর দাড়ি দুইই রাখতেন বলে বয়স তাঁর একটু বেশী মনে হলেও চল্লিশের খুব বেশী ছিল না।

চলে গেলেন পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চি। ছুঃখ পেলাম আমি—ওঁর ঐ তিলক কামোদের গানখানা আমার কানে বড় ভাল লেগেছিল। নীর ভরন কায়সে জাউ—আহা হা!

মন হয় তো নিমাই হালদারেরও খারাপ হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তিনি গান শোনা ছাড়লেন না। জুলফিকার খাঁ ভাল গায়, এ কথা তিনি অস্বীকারও করলেন না। ক্রমে বিপিন চাট্টো, সলিল দত্ত, বক্সিম ভট্টাচার্য, দীপেন শাস্মল—এদের সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করলেন জুলফিকার খাঁর সঙ্গে গগন খাজাঞ্চির কোন তুলনাই হতে পারে না। নিতান্ত গৌরো যোগী বলেই অ্যাঙ্গিন ভিখু পেয়েছিল।

গগন খাজাঞ্চি চলে যাওয়ার কিছুদিন বাদেই হল নিখিল ভারত বৈজ্ঞানিক সংগীত সম্মেলন—বিখ্যাত গায়ক ও বৈজ্ঞানিকের পুণ্য স্মৃতি মাথায় নিয়ে। পাড়ার গান-প্রিয়রা দল বেঁধে গেলাম গান শুনতে। সম্মেলন মাত করে দিলেন এলাহাবাদের সঙ্গীত-সিংহ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেব। যেমন দাপট, তেমনি লয়দার, তেমনি দরদ-ভরা, তেমনি সুরেলা। তুলনা নেই, তুলনা নেই, তুলনা নেই। রীতিমত গানের জাহকর। ক্ষণজন্মা পুরুষ।

এক দিন খান বাহাদুর মির্জা আলি সাহেবের বাড়ির চারতলায় আমরা খাঁ সাহেবের সঙ্গে ঘরোয়া মোলাকাৎ করতে গেলাম। খাঁ সাহেব খান বাহাদুরের অতিথি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদেরই

পাড়ার রায় সাহেব করুণাসিদ্ধু মন্ডির। তিনি মির্জা আলি সাহেবের পরম দোস্ত। মির্জা আলিই ব্যবস্থা করেছিলেন খাঁ সাহেবকে ঘাটে আমরা একান্তে পাই, অন্ত লোকের উপস্থিতির বাধা না থাকে।

সংগীত-সিংহ কি কঠোর সাধনা করে তবে সিংহ হয়েছেন তাই তাঁর নিজের মুখে শুনে আমরা মুগ্ধ হলাম। বিদায় নিয়ে আসবার আগে বললেন “আমার এক ভাগনে আছে তার কথা আপনারা হয়তো শুনেছেন।”

“শুনেছি বটে।” বললেন বিপিন চাটুয্যে, যিনি শহরে বা শহরতলীতে ওস্তাদী গানের কোন বড় আসর পারতপক্ষে বাদ দেন না।

“শুনেছি,” বললেন বিপিনবাবু, “তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, প্রকৃতি একটু উদাসী, দিনরাত সুরে ডুবে আছেন, এখনো তাকে আপনি কোথাও বাইরে গাইতে দেন নি, তিনি নিজেকে জানেন না তিনি কত বড় গাইয়ে।”

“ঠিক শুনেছেন।” বললেন ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেব। “গানের ছনিয়া শুধু জানে আমার এক ভাগনে তৈরী হচ্ছে, জানে না কি অদ্ভুত তৈরী হয়েছে। সে যখন আসরে গাইতে নামবে, তখন বড় বড় ওস্তাদের মুখ বিলকুল চুন হয়ে যাবে। আমাকে যদি ওস্তাদ বললেন তো আমার বয়সে ও হবে ওস্তাদের শাহেন্শা।”

“কি নাম ওঁর, ওস্তাদ সাহেব?”

“জানতে পারবেন দু-এক বছরের ভেতর।” বললেন ওস্তাদ সাহেব।

এইবারে বলি ওস্তাদ গুরগন খাঁর তিলক কামোদের কথা। একটু আগে থেকেই শুরু করি।

উক্ত ঘটনার প্রায় বছর খানেক বাদে এলাহাবাদে সংগীত সম্মেলন গুনতে চলে গেলেন নিমাই হালদার। সেই সম্মেলনে গাইবেন

ওস্তাদ-সিং তোফাজ্জল হোসেন খাঁ সাহেবও। তাঁর একদিনের গান এলাহাবাদের বেতার থেকে হাওয়ার ছাড়া হল, আমরা বেতারে শুনলাম আমাদের শহরে বসে।

কিরে এসে পাড়ার সঙ্গীতমোদী সবাইকে চমক লাগিয়ে দিলেন নিমাই হালদার। ওস্তাদ তোফাজ্জল হোসেন খাঁ সাহেবের সেই আশ্চর্য ভাগনের আশ্চর্য গান শুনে এসেছেন তিনি।

“কি নাম ওঁর?”

“জানি না। যেদিন গান শুনবেন সেদিনই নামও শুনবেন।” বললেন নিমাই হালদার।

“কবে শুনতে পাব ওঁর গান?”

“শীগগিরই শোনাব। তারও ব্যবস্থা করে এসেছি। আশ্চর্য ভক্তলোক এই ওস্তাদ তোফাজ্জল হোসেন খাঁ। তার চাইতে বেশি আশ্চর্য ওর ভাগনে। আপনারা গগন খাজাফির তিলোক কামোদ শুনেছেন তো—সেই নীর ভরন কায়সে জাউ? ঠিক এই গানখানাই শুনবেন তোফাজ্জল হোসেন সাহেবের ঐ ভাগনের মুখে। আকাশ-পাতাল তফাত, যাকে বলে হেভ্‌ন্‌ অ্যাণ্ড হেল।”

আমরা অধৈর্য। আর তর সহিছে না, বুক ফাটছে কৌতূহলে। কৌতূহল শীগগিরই মিটবে, ভরসা দিলেন নিমাই হালদার।...

তার পর একদিন।

শৌখিন মহা-বড়লোক রঞ্জন চৌধুরীর বাড়িতে স্বরোয়া গানের আসর। গাইতে এসেছেন জুলফিকার খাঁ। রঞ্জন চৌধুরী নিমাই হালদারের বিশিষ্ট বন্ধু।

গান শুনতে এসেছেন শহরের সেরা সেরা সঙ্গীত-বোদ্ধা, সেরা সেরা সংগীতজ্ঞ। আজ সেরা গান শোনাবেন শহরে এখানকার সেরা নামী গাইয়ে জুলফিকার খাঁ। শোনা গেল ফাউ হিসেবে আরেক জন গাইয়েও গান শোনাবেন। শোনা গেল না কে সেই গাইয়ে!

গান ধরলেন জুলফিকার খাঁ। সজত করলেন তবল্‌চী নিয়ামৎ খাঁ।
 বাঁধা তবল্‌চী, জুলফিকারের চাচার প্রিয়তম দোস্ত। সঙ্গে সারঙ্গী
 বাজালে বিখ্যাত সারঙ্গী ওস্তাদ খাঁ। গান থামার সঙ্গে সঙ্গে
 উচ্ছ্বসিত হাততালি, কেয়াবাত, বলিহারি ইত্যাদির জগাখিচড়ি।
 গর্বিত বিনয়ে গৌঁফে তা দিলেন জুলফিকার খাঁ। নিয়ামত খাঁ
 বললেন “শুনলাম আর কে একজন নাকি গাইবেন। এর পর তিনি
 গাইবেন কি?” কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের সুর, হাসিতে চ্যালেঞ্জের ইঙ্গিত—
 “এসো কার সাহস আছে এর পর গাইবার। এসো দেখি, গেয়ে
 কেমন জমাতে পার!”

এইবার উঠে দাঁড়ালেন গৃহস্থামী রঞ্জন চৌধুরীর বন্ধু আমাদের
 পাড়ার নিমাই হালদার। বললেন “এ গানের পর অশ্রু কারও
 গান গেয়ে জমানো শক্ত। কিন্তু জুলফিকার খাঁ সাহেবের একটু
 বিশ্রাম দরকার, সেই সময়টুকু ভরবার জন্তে যিনি গাইবেন তাঁকে
 নিয়ে আসছি।”

নিয়ে এসে বসালেন তাঁকে। পাতলা, মাঝারি গড়নের চেহারা
 পরনে পাজামা আর শেরওয়ানী, মাথায় তুর্কী টুপি, ছাটি চোখ পুরু
 ক্রেমের কালো কাচের চশমায় ঢাকা, গলা ঘিরে উলের মাফ্লার
 জড়ানো, পরিকার কামানো মুখে ব্যাখামলিন হাসি লেগে আছে।
 লোকটি হয় সম্পূর্ণ অন্ধ, অথবা ক্ষীণদৃষ্টি। সম্ভবত একেবারেই
 অন্ধ।

“ইনি সম্প্রতি এসেছেন এলাহাবাদ থেকে।” পরিচয় দিতে
 দাঁড়িয়ে উঠে বললেন নিমাই হালদার। “ওস্তাদ গুরগন খাঁ।”

গুরগন খাঁ ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন
 “মাফ কিজিয়ে। মায় ওস্তাদ নহী হুঁ, এক মামুলী গাবৈয়া।
 গাবৈয়া ভি নহী, অভীতক খোড়া হি সীখা মায়নে। আপ লোগ
 মেরা গানা শুনেঙ্গে, ইয়ে আপলোগোঁকী বড়ী হি মেহেরবানী।”

বিনীত প্রার্থনা পরম উদারতা দেখিয়ে মঞ্জুর করলেন ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। নিজের তানপুরো তুলে দিলেন দৃষ্টিহীন অথবা দৃষ্টিক্ষীণ গুরগন খাঁর হাতে, চাচা-প্রতিম নিয়ামৎ খাঁকে হেসে বললেন, গুরগন খাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতে, ওস্তাদ মনু খাঁকে অমুরোধ করলেন গুরগন খাঁর সঙ্গে সারঙ্গী বাজাতে। তারপর পরম তাজিল্য দেখিয়ে গুরগন খাঁর দিকে পেছন ফিরে বসে ধূমপান করতে লাগলেন।

কিন্তু গুরগন খাঁ গান ধরতেই সারা আসরে শিহরণ জাগল। গানের মুখ ধরবার কী আশ্চর্য কায়দা। সেরা সেরা সমঝদারেরা তারিফ করে বলে উঠলেন “হায় হায় হায়!” সন্তুষ্ট হয়ে আবার এদিকে ঘুরে বসলেন বাঘা ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। অনেকে লক্ষ্য করলেন, একটু যেন উদ্বেগের ছায়া পড়েছে তাঁর মুখে; আগেকার সেই বেপরোয়া তাজিল্যের ভাব আর নেই। আশ্চর্য হুর, আশ্চর্য লয়, আশ্চর্য মর্দানা অথচ মিঠে কণ্ঠস্বর গুরগন খাঁর। যাকে বলে বুলন্দ আওয়াজ। আর কি চমৎকার বন্দেজ আস্থায়ী অন্তরার!

চোখে চোখে কি যেন ইশারা বিনিময় হয়ে গেল তিন জনের ভেতর—জুলফিকার, নিয়ামৎ আর মনু খাঁ। নিয়ামৎ তবলার মহা প্যাঁচালো গাইয়ে-জব্ব করা বোল বাজাতে লাগলেন আড়ি কু-আড়িতে। লয়ের লড়াইতে নাকাল করবেন গুরগন খাঁকে। আসরে সবাই এ অশোভন ব্যাপার দেখে ক্ষুব্ধ হলেন। গুরগন খাঁর গান মাটি করে দেবার জগ্গে উঠে পড়ে লেগেছে নাকি নিয়ামৎ তবল্‌চী!

গুরগন খাঁ বিনয় করে বললেন “সীধা ঠেকা বাজাইয়ে ওস্তাদ।”

ওস্তাদ নিয়ামৎ বিক্রপভরা কণ্ঠে বললেন “ক্যা আপ নয়া গাটবোয়া হায় খাঁ সাহাব?”

গুরগন খাঁ মুহূর্ত হাসলেন। আনাড়ী গাইয়ে, তবলায় একটু শব্দ বোল বাজালেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন, এই বলে তাঁকে ঠাট্টা করছেন তবল্‌চী

নিয়ামৎ! বললেন “বহুৎ আচ্ছা, বাজাইয়ে শ্যামসী আপকী মরজী।” বলে বিষম ছন্দের শব্দ লয়ের তেলেনা ধরলেন একথানা :

“তানা ধিং তুম জিতানা দেরে না, তানা দেরে না, তানা দেরে না।”

গুরগন খাঁকে লয়ের খেলায় বেকায়দায় ফেলতে গিয়ে নিজেই বেকায়দায় পড়ে গেলেন নিয়ামৎ খাঁ। কয়েকবার সমে পৌঁছতে ভুল করে ফেলে হাশ্বাস্পদ হলেন। আহত, অবসন্ন, অসহায় ইত্বরকে নিয়ে বেড়াল যেমন খেলা করে, নিয়ামৎ তবল্চীকে নিয়ে সেই রকম অবলীলাক্রমে খেলতে লাগলেন গুরগন খাঁ। লয়ের সমুদ্রে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে কাটতে হাবুডুবু খেতে লাগল ঝানু তবল্চী নিয়ামৎ খাঁ। অনেক তবল্চী-জব্দ-করা লয়বাজ কালোয়াত গাইয়ের সঙ্গে সঙ্গত করে ঝাণ্ডা উঁচা রেখে এসেছেন তিনি, আজকের মত এমন নাকাল কোন দিন হয় নি। তাঁর ফরসা মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। নিয়ামৎ কিছুতেই ঠিকমত লয়ে আসতে পারছেন না দেখে সাময়িকভাবে গান থামিয়ে আবার তেমনি মুছ অনুকম্পার হাসি হাসলেন গুরগন খাঁ। নিয়ামৎ খাঁর হাত থেকে বাঁয়া তবলা টেনে নিয়ে বললেন “দেখিয়ে সাহাব, আয়াসে বজানা।” বলে নিজে বাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন এ তেলেনার সঙ্গে কি ভাবে বাজালে ঠিক মিলবে। বিস্ময়ে ‘কেয়াবাত’ বলে উঠলেন নিজের অজ্ঞাতসারেই নিয়ামৎ খাঁ। নিজে গেয়ে গেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কী নিখুঁত সঙ্গত আপন হাতে বাজাচ্ছেন গুরগন খাঁ। লয়ের ওপর এমন আশ্চর্য দখল তাঁর তবল্চী-জীবনে কমই দেখেছেন নিয়ামৎ। মানে মানে হার না মানলে পরে নাক আর কান দুই কেটে বিদায় নিতে হবে ভেবে নিয়ামৎ বললেন “গোস্তাকি মাফ কীজিয়ে ওস্তাদ।” অর্থাৎ অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করুন।

বোঝা গেল বিষদাঁত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে নিয়ামতের, ওস্তাদ গুরগন খাঁ লয়ের প্যাঁচে তার মত কয়েকটি তবল্চীকে একসঙ্গে গুলে খেতে পারেন, একথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন নিয়ামৎ। গান-মাটি-করা

লয়-লড়াইয়ের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন আসরের সবাই, এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এইবারে সত্যিকারের সঙ্গীত হবে জমজমাট।

আমি বুঝলাম, আরও অনেকেরই বুঝতে বাকী রইল না। এই গুরগন খাঁ-ই সংগীত-সিংহ ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ। সাহেবের সেই আশ্চর্য ভাগনে, দীর্ঘ গোপন সাধনার পর প্রকাশ্য আসরে গান গাওয়া তাঁর এই প্রথম। এঁর গান শুনে মুখ চুন করে বসে আছেন জুলফিকার খাঁ।

আমাদের পাড়ার যাঁরা ঝাঁক বেঁধে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা প্রায় একমত হয়েই ফরমাশ করলেন তিলক কামোদ। বড় মিঠে এই রাগিণী। আর এই তিলক কামোদই গেল বছর আমরা শুনেছি পাড়ার গাইয়ে গগন খাজাঞ্চির মুখে।

“নীর ভরন কায়সে জাউঁ সখিরি”—চৈঁচিয়ে বললেন দীণেন শাসমল, বঙ্কিম ভট্টাচার্যি, আরো অনেকে।

ফরমাশ রাখলেন গুরগন খাঁ। গাইলেন ঐ গানখানাই। দেখা গেল যেমন বন্দেজ গাইতেন গগন খাজাঞ্চি, খাঁ সাহেবের আস্থায়ী অন্তরার বাণী এবং বন্দেজ সেই একই রকম। শুধু……

“কিন্তু খাঁ সাহেবের কি আশ্চর্য গায়ন ভঙ্গী লক্ষ্য করেছ?” বললেন আমাদের পাড়ার সমঝদারেরা। “ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহেবের ভাগনে না হয়ে যায় না।”

গানের শেষে তবল্‌চী নিয়ামৎ খাঁ আর সারঙ্গী ওস্তাদ মন্সু খাঁ পর্যন্ত জুলফিকার খাঁর উপস্থিতি ভুলে গিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন :

“আয়সা তিলক কামোদ কতী নহী শুনা খাঁ সাহাব। কহিয়ে ইয়ে তোফাজ্জল হুসেন খাঁ সাহাবকা তালিম হ্যায় না?”

“খুদাকা মেহেরবাণী, ঔর—” হাসলেন ওস্তাদ গুরগন খাঁ, কথাটা সমাপ্ত না করেই।

এর পর আমাদের পাড়াতেও কয়েকটা বৈঠকে আমরা গাওয়ালাম ওস্তাদ গুরগন খাঁ সাহেবকে। নিমাই হালদারের একান্ত অনুরোধেই

গাইতে রাজী হলেন খাঁ সাহেব। বললেন অবশ্য, “অভীতক কুছ নহী সীখা। ক্যা হুনাউ ?”

খাঁ সাহেব! খাঁ সাহেব! খাঁ সাহেব! আমাদের পাড়ার মহামানব হয়ে উঠলেন তিনি। এমন গাইয়ে আর হয় না। অতুলনীয়! অপ্রতিদ্বন্দ্বী! অভূতপূর্ব! ওস্তাদ তোফাজ্জল হুসেন খাঁকে অনায়াসে ছাড়িয়ে যাবেন গুরগন খাঁ। পাড়ার অনেক গাইয়ে কোমর বাঁধলেন গুরগন খাঁকে এখানেই ধরে রাখবেন, আর তালিম নেবেন তাঁর কাছে। এমন ক্ষণজন্মা ওস্তাদকে ছাড়া যায় না।

কিন্তু এক দিন হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেল। ভাঙলেন গুরগন খাঁ নিজেই। তুর্কী টুপি আর চোখের ঠুলি খুলে ফেলে স্বপরিচয়ে প্রকাশ করলেন নিজেকে—তিনি গগন খাজাঞ্চি। গুরগন খাঁ তাঁর ছদ্মবেশ মাত্র!

এর পর দিন দশেকের ভেতরই সবাই বুঝে ফেললেন তাঁর গান আসলে উঁচুদরের নয়। কালীধামেই সুতরাং ফিরে যেতে হল গগন খাজাঞ্চিকে।

আবার আসর জাঁকিয়ে বসলেন ওস্তাদ জুলফিকার খাঁ। বিপিন চাট্টায়ে বললেন “এ হল খানদানী গুণী। এর সাম্নে ফাঁকিবাজি কদিন টেকে? গগন খাজাঞ্চি কি না—হেঃ হেঃ হেঃ—”

*

*

*

ঝিমুতে ঝিমুতে সহসা মনে হলো ট্রেনটা চলার বেগে প্রচণ্ড মাতলামি শুরু করেছে; কখনো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কখনো ডাইনে বাঁয়ে হেলে ছলে ছুরন্ত বেগে এগিয়ে চলেছে অন্ধকার ভেদ করে আরো অন্ধকারের দিকে। দূর থেকে যেন ভেসে আসছে মকবুল হোসেনের শেষ সানাইর সুর। কানের সামনে কে যেন গুন্ গুন্ করে গাইছে “মনে করো শেষের সেদিন ভয়ংকর।”

একটি ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলেছে নানা জাতের, নানা ভাষার, নানা বয়সের নরনারীতে বোঝাই অনেকগুলো কামরা। এতগুলো মানুষের জীবন মরণ ঐ ইঞ্জিন ড্রাইভারের হাতের মুঠোয়। তারি ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে প্রায় সবাই নিশ্চিত—পাকা ড্রাইভার, ট্রেনটি ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যাবে। হোক অন্ধকার, আশ্রুক দুর্ঘোগ, কোনো ভাবনা নেই। পাকা কাণ্ডারী, যাত্রীদের হুঁশিয়ার হবার দরকার নেই কোনো। ট্রেনের লক্ষ ঝঙ্ক আর দোতুল ছলুনি তাই পারে নি অনেকের ঘুম বা তন্দ্রা ভাঙাতে। ড্রাইভারের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস, অসীম নির্ভর, গোটা ট্রেনকে চোখের সামনে সোজা জাহান্নামের দিকে চালিয়ে নিলেও এরা বিশ্বাস করবে ট্রেন চলেছে নিশ্চিত স্বর্গ-ধামে।

কিন্তু আমার পেছনের কামরায় যেন টলে উঠেছে বিশ্বাস, হারিয়ে গেছে ভরসা। আগে যেখানে ছিল সন্দেহের দোলা, সেখানে এসেছে নিশ্চিত, সংশয়াতীত, বদ্ধমূল মহাভয়। চরম খেপা খেপেছে ড্রাইভার, পুরো বেহুঁশ হয়ে গেছে চরম মাতলামির নেশায়। এই চূড়ান্ত খাপা চূড়ান্ত মাতাল খামখেয়ালী ড্রাইভারের ইঞ্জিন পরিচালনায় মস্ত লম্বা ট্রেনটি হু হু করে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। ব্রেক খারাপ হয়ে গেছে ইঞ্জিনের, ব্রেক কষ্টে এক কোঁটা রাজিও নয় ড্রাইভার। ড্রাইভারকে সামলাবার কেউ নেই। পেছনে গার্ড আছেন বটে; ভ্যাকুআম ব্রেক কষে দেওয়ার হুক তার আছে। কিন্তু ড্রাইভারকে ঘাঁটাবার কামেলায় পা বাড়াতে রাজি নন তিনি। কামরায় কামরায় বিকল হয়ে রয়েছে ট্রেন থামাবার শিকল।

বাইরে মহাদুর্ঘোগের ঘনঘটা—চলতি ট্রেনের সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে। মাঝে মাঝে হঠাৎ লাগছে কালো হাওয়ার প্রচণ্ড ধাক্কা। মনে হতে লাগল পালিয়ে এসেছি বটে শকুন্তল। স্ত্রানোটোরিআম

থেকে, কিন্তু ঘরে ফেরা হয় তো আর হয়ে উঠবে না, খ্যাপা মাতাল ড্রাইভারের হাতে এ ট্রেনের আর নিস্তার নেই। হয় রে অসহায় যাত্রিদল !

হঠাৎ খেয়াল করা গেল চলতি ট্রেনের এ কামরায় আমি একা নই, ও ধারে বসে আছেন অপরাধী এক নারী মূর্তি ! দেখি নি, কিন্তু তবু মনে হলো শকুন্তলা স্তানাটোরিআমে এঁকে দেখেছি, অন্তত দেখা উচিত ছিল। এঁর সারা চেহারা জুড়ে কেমন একটা অনির্বচনীয় শকুন্তলা শকুন্তলা ভাব। আমার মনে সন্দেহের উদয় হলো। আমি প্রশ্ন করলাম “আপনিই কি…… ?”

নারীমূর্তি কোনো জবাব না দিয়ে নিজের যুগল অধরের নাকখানে খাড়া তর্জনী চেপে ইশারায় জানালেন “চুপ !” আমি চুপ করে গেলাম বটে, কিন্তু মন থেকে সেই সন্দেহটিকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার হলো না। এই সহসা আবির্ভূত নারী মূর্তিকেই আমি মনে মনে চিনে নিলাম শকুন্তলা বলে।

বললাম “ড্রাইভারের নিজের কি ভয় নেই ? গোটা ট্রেন মারা পড়লে ড্রাইভার নিজেই কি বাঁচবে ? ট্রেনকে খাদে ফেললে সে কি নিজেও খাদে পড়বে না ?”

শকুন্তলা বললে না কিছু, মূহু হাসলে শুধু। কিন্তু কি আশ্চর্য ভাবাময় সেই নীরব হাসি ! আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম সেই হাসিতে শকুন্তলা বলতে চাইছে “না। ড্রাইভার নিজের সখ্য অত কাঁচা ছেলে নয় ; ট্রেন খাদে পড়বার আগেই লাফিয়ে পড়ে পগার পার হয়ে যাবে। পরের বেলায় যত খ্যাপা আর যত মাতালই হোক না কেন, নিজের বেলায় সে তালে ঠিক। সব ড্রাইভারই কম বেশি তাই হয়ে থাকে, বিশেষ করে—”

সহসা একি ! এই প্রবীণ ভদ্রলোকটিকে তো এতক্ষণ খেয়াল করি নি। এঁর হু হাত এবং মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে, মুখ

থেকে নির্গত হচ্ছে বাণী অবিরাম ধারায়। শুনে কখনো কখনো মনে হচ্ছে এ তাঁর দ্বিতীয় শৈশব, কখনো বা……………

আমার চিন্তাধারায় বাধা দিয়ে শকুন্তলা শুধালে “এঁকে চিনতে পারলেন খনপতিবাবু?”

চেনা চেনা লাগছিল। তবু বললাম “কে ইনি?”

শকুন্তলা বললে “এঁকে একজন বিশেষ ব্যক্তি বলেও ধরতে পারেন, অথবা প্রতীক বা প্রতিনিধি বলেও মনে করতে পারেন। অসংখ্য নরনারীর বর্তমান আর ভবিষ্যত, কল্যাণ আর অকল্যাণ এঁর করায়ত্ত। কল্যাণ করতে পারুন আর না পারুন, অকল্যাণ করবার ক্ষমতা এঁর অসীম। ইনি একজন বহুজনগণভাগ্যবিধাতা। ইনি একজন একচ্ছত্র মহাকর্ণধার, এঁর কর্ণধারণ করবার কেউ নেই। ভেবে দেখুন গোটা দেশের ভবিষ্যত এঁর খামখেয়ালের ওপর ছেড়ে দিয়ে প্রায় গোটা দেশ ঘুমিয়ে আছে, বুঝেও বুঝতে চাইছে না মহাকর্ণধারের এখন স্থানাটোরিআমে বিশ্রাম দরকার।”

আমি শিউরে উঠলাম শকুন্তলার কথা শুনে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ছলে উঠল গাড়ি। মাতাল উম্মাদ বেপরোয়া ড্রাইভার বাধাহীন খামখেয়ালে সমস্ত ট্রেনটাকে কি বীভৎস পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে কে জানে?

বললাম “উপায় কি নেই, শকুন্তলা?”

শকুন্তলা বললে “জানিনে আছে কিনা। জানিনে কি উপায় আছে। এই শুধু জানি যে যাদের আসল ঠাই স্থানাটোরিআমে, তাঁদের অনেককেই স্থানাটোরিআমে না পাঠিয়ে বিধাতা বসান বহু-জনভাগ্যবিধাতা কর্ণধারের গদিতে। বিধাতার সেই উম্মাদ খামখেয়ালের মাণ্ডল জুগিয়ে মরে অগুন্তি হতভাগ্য শিশু-বৃদ্ধ-নর-নারী। আহা, যদি এই কর্ণধারদের কোনোরকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে স্থানাটোরিআমে পাঠানো যেত!”

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো শকুন্তলার বক্ষ থেকে।
কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শকুন্তলা, ছুনিয়ার নিদারুণ ট্র্যাজেডির কথা
ভেবে।

কান্না উঠল আমারও হৃদয়ের ঢুকুল ছাপিয়ে। চিৎকার করে
উঠলাম “শকুন্তলা! শকুন্তলা!”

কিন্তু একি! কোথায় শকুন্তলা? কোথায় সেই মহাভাষণরত
প্রবীণ মহাকর্ণধার? কোথায় মহাহুঁহোগের ঘনঘটা? দেখলাম
কামরায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাইরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি,
মুহু মুহু রোদ। ট্রেন পৌঁছে গেছে এ লাইনের শেষ স্টেশনে।

একা নামলাম ট্রেনের কামরা থেকে।